শিল্পদৃষ্টি

অরবিন্দ পোদ্দার এম-এ, ডি-ফিল

ইণ্ডিয়ানা লিমিটেড
২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

এই পুস্তকে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি 'ক্রান্তি' 'সত্যযুগ' ও 'গণবার্তা' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সুযোগে সংশ্লিষ্ট সম্পাদকদের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাই।

—লেখক

মার্ক্স এঙ্গেলস্‌ ও শিল্পদৃষ্টি

এক

শ্রেণীসংগ্রামের 'নাইট' কার্ল মার্ক্স বছরে একবার ক'রে এস্‌-কাইলাস পড়তেন; হাইনে ও গ্যেটের রচনা প্রায় মুখস্থ বলতে পারতেন; অসম্ভব রকমের ভক্ত ছিলেন সেক্সপীয়রের; সামাজিক-অর্থনৈতিক ইত্যাদি সমস্যার ব্যাখ্যানে সেক্সপীয়র থেকে উদ্ধৃতি দিতেন প্রচুর আর তাঁর বাড়ীতে দস্তরমতো সৃষ্টি করেছিলেন একটা সেক্সপীয়র-পরিবেশ; তাছাড়া শেলী, বায়রণ, বালজাক, এবং সমসাময়িক অন্যান্য ফরাসী, ইংরেজ ও জার্মান সাহিত্যিকদের রচনা যখনই হাতের কাছে পেতেন আকণ্ঠ পাঠ করতেন; প্রথম যুগের মানব ইতিহাসের শ্রেণীসংগ্রামের একটি অধ্যায়কে অবলম্বন করে একটি নাটক রচনার ইচ্ছেও তাঁর ছিল; শেষ জীবন পর্যন্ত মার্ক্স-বাদের অন্যতম স্রষ্টা ও বন্ধু এঙ্গেলসের সঙ্গে পত্রালাপে আলোচনা করতেন শিল্প-সাহিত্যের তাৎপর্য অথবা বিশেষ কোন কবি বা কাহিনীকারের রচনা-শৈলী সম্পর্কে। অর্থাৎ, সমাজ-মানুষের অন্যবিধ প্রত্যক্ষ কর্ম (যেমন অর্থনৈতিক উৎপাদন সংক্রান্ত) সম্পর্কে তাঁদের আগ্রহ ও বিশ্লেষণপ্রয়াসী দৃষ্টি যেমন ছিল সদাজাগ্রত, তেমনি মানুষের ভাবজীবন, মানুষের শিল্পকর্ম সম্পর্কেও তাঁদের চোখের মনের দ্বার ছিল খোলা। কেননা, শিল্পকর্মও সামাজিক সম্পর্কের বন্ধনে

আবদ্ধ মানুষেরই কর্ম, মানুষের যে ক্রিয়ায় সমাজের, পৃথিবীর, স্বয়ং মানুষের হয় নব নব রূপায়ণ, সেই সার্বিক কর্মেরই অন্তর্গত। বলাবাহুল্য, শুধুমাত্র আনন্দানুভূতি, চিত্ত-পরিতোষ অথবা অলস মুহূর্তের অবলম্বন হিসাবেই মার্ক্স-এঙ্গেলস্ শিল্প-সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন না, তাঁদের কাছে এর আবেদন আরও বেশী অর্থবহ, আরও বেশী ব্যাপক। বিশ্ব সাহিত্যের স্মরণীয় শিল্পীদের রচনায় কী পেলে তাঁরা মোহিত হ'তেন, অথবা কী পেলে তাঁরা সেই রচনাকে সৃষ্টির ক্ষেত্রে সার্থক বলে গণ্য করতেন, তা তাঁদের দু'জনেরই রচনার মধ্যে ইতস্তত: ছড়ানো রয়েছে। বর্তমান আলোচনার সূত্রপাতের জন্য এখানে শুধু দু'টো উক্তি উদ্ধৃত করা হচ্ছে। গ্যেটে সম্পর্কে এঙ্গেলস্ বলছেন, যা মানবিক কেবলমাত্র তার মধ্যেই গ্যেটে অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ-বিহার করতে পারতেন; তাঁর এই মানবিকতা, ধর্মের শৃংখল থেকে শিল্পের এই মুক্তির মধ্যেই নিহিত আছে গ্যেটের মাহাত্ম্য (He felt himselt at home only in the human, and it was this humanity, this emancipation of art from the fetters of religion that determined Goethe's greatness); আর ভিক্টোরিয়ার আমলের বস্তু-নিষ্ঠ ইংরেজ ঔপন্যাসিকদের সম্পর্কে বলছেন কার্ল মার্ক্স, ইংল্যাণ্ডের সমকালীন প্রতিভাবান ঔপন্যাসিকবৃন্দ পৃথিবীর যে মুখর ও পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র এঁকেছেন (eloquent and graphic portrayals of the world), তাতে গভীর রাজনৈতিক ও সামাজিক সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে; পেশাদার রাজনীতিবিদ, ও প্রচারবাগীশ প্রভৃতি সকলে মিলেও এতটা করতে পারতেন না।

মানবিকতা ও জীবনের সজীব রূপায়ণ, সাহিত্যে এদু'টো গুণেরই খুব বেশী সমাদর করতেন মার্ক্স-এঙ্গেলস্। অবশ্য এছাড়াও আছে শিল্পীর রচনাকৌশল ও রচনার দেহ সৌষ্ঠব, যার মূল্যও তাঁরা কোনকালেই অস্বীকার করেন নি।

দুই

মানুষের শিল্পকর্মের স্বরূপ কি, শিল্প-সাহিত্যে মানবিকতা ও জীবন রূপায়ণ কিভাবে সার্থক হয়ে ওঠে, তার বিস্তৃত আলোচনা করার অবসর মার্ক্স-এঙ্গেলস্ পান নি। কিন্তু ঐতিহাসিক বিবর্তনের স্বরূপ, ও বিবর্তনে মানুষের কর্মের স্থান কি, তা নির্দ্ধারণ করতে গিয়ে তাঁদের চিন্তায় যে সত্য ধরা পড়েছে, সেই সত্যের আলোকেই মানুষের শিল্পকর্মের স্বরূপও প্রতিভাত হয়।

মানব ইতিহাসের প্রথম প্রভাত থেকে মানুষ যাত্রা করেছে—যাত্রা করেছে নিজেকে জানার, উপলব্ধি করার পথে। এই উপলব্ধির পথে সে এক রূপ থেকে আরেক রূপে, এক স্বভাব থেকে আরেক স্বভাবের মধ্যে রূপান্তরিত হয়ে চলেছে, এক সমাজ আরেক সমাজে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। এই হওয়া, নূতন কিছু হওয়া, রবীন্দ্রনাথের কাছে যেমন সত্য মার্ক্স-এঙ্গেলের কাছেও তেমনি সত্য; হয়তো বা আরও বেশী সত্য। পরিবর্তন বা রূপান্তরই ইতিহাসের শাশ্বত সত্য, আর এই পরিবর্তন নিরবচ্ছিন্ন, ছেদহীন। আগের দিনের রাত্রি শেষ হওয়ার আগেই পরের দিনের প্রভাত চিক্ চিক্ করতে থাকে; তাই কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা টেনে বলা যায় না, এইখানে রাত্রির শেষ, আর এইখানে দিনের আরম্ভ। তেমনি মানুষের এক

রূপের মধ্যেই আরেক রূপেব আবির্ভাব, এক সমাজের অন্তরেই নতুন সমাজের লক্ষণ, পুবাতন সত্তার মধ্যেই নতুন সত্তার আবির্ভাব।

মার্ক্স-এঙ্গেলসের সমাজ-চিন্তায় বিবর্তনের এই নিরবচ্ছিন্ন ধারা যত সত্য ও সার্থকরূপে ধবা পড়েছে, আর কোন চিন্তা-নায়কের কাছেই তা পড়ে নি। ইতিহাস একটানা বয়ে চলেছে, সমাজ ও জীবন একটানা বযে চলেছে; এই প্রবাহের পথে পুবানো সত্তা ছেদহীনভাবে ধ্বংস হয়ে চলেছে, নতুন সত্তা অবিবাম নিজেকে সৃষ্টি করে চলেছে, ধ্বংস ও সৃষ্টির এই সামগ্রিক ঐক্যরূপের ভিতর দিয়েই হয়ে চলেছে মানুষের, মানুষের সমাজেব, বিকাশ। জীবনের এই সদাবিকাশমান সত্তাই মার্ক্স-এঙ্গেলসের সমাজ-চিন্তার মূল কথা।

তাই তাঁরা যখন জীবন বা সমাজ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, তখন শুধু জীবন বলেন নি, বলেছেন জীবন-প্রবাহ (life process), বলেন নি সমাজ, বলেছেন সমাজ-প্রবাহ (social process); তেমনি অর্থেই তাঁবা ব্যবহার করেছেন, labour process, whole process ইত্যাদি। অর্থাৎ বিকাশের সমগ্র রূপটাই-ing' অথবা -ইতেছে'র লীলাখেলা। এঙ্গেলস্ তাই স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন, পৃথিবীটা কোন একটা রেডি-মেড পদার্থ নয়, একটি জটিল প্রবাহ; এর মধ্যে অবিরাম আবির্ভাব ও অবিরাম তিরোভাব হয়ে চলেছে (The great basic thought that the world is not to be comprehended as a complex of ready-made things, but as a complex of process, in which the things apparently stable not less than their mind-images in our heads, the concepts, go through an uninterrup-

ted change of coming into being and passing away……) একদিকে ধ্বংস-হ'তে-থাকা পুরাতন, আরেক দিকে সৃষ্টি-হ'তে-থাকা নতুন, এই দু'য়ের সামগ্রিক রূপটাই একটি বিশেষ ঐতিহাসিক লগ্নে বিশেষ কালের পরিচয়।

এটাই সমাজ-প্রবাহের মূলকথা, এটাই বিবর্তনের সত্য-স্বরূপ। এই সজীব জীবন-প্রবাহকে যখন জানা যায়, তখন ইতিহাস আর কতগুলো প্রাণহীন ঘটনার সমষ্টি হ'য়ে দাঁড়ায় না, অথবা ভাব-বাদীদের কথামত কোন কল্পিত পুরুষের কল্পিত কর্মলীলা বলেও আখ্যাত হ'তে পারে না (The German Ideology—Marx-Engels); ইতিহাস মানুষের কর্মের মাধ্যমে সত্য হ'য়ে উঠে।

সমাজ বা জীবন-প্রবাহের মধ্যে মানুষের কর্মও তাই অপরিহার্য অঙ্গ। প্রকৃতির বুকে এমন কি মানুষের সমাজেও, প্রতিনিয়ত রূপান্তর হয়ে চলেছে, এই পরিবর্তন কোন মানুষেরই ব্যক্তিগত মতামত ইচ্ছা অনিচ্ছা চাওয়া-না-চাওয়ার ধার ধারে না। কিন্তু, তা সত্ত্বেও, এই রূপান্তরের ধারার সংগে যখন সমাজ-সম্পর্কের মধ্যে আবদ্ধ বহু মানুষের কর্মের বহুমুখী ধারা এসে মিলিত হয়, তখনই মানুষের সমাজ বদলায়, রূপান্তরিত হয়। তাই কোন বিশেষ ঐতিহাসিক কালে মানুষের কর্মের তাৎপর্যও ব্যাপক।

বিশেষ কোন এক ঐতিহাসিক কালে মানুষের সম্মুখে বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন বা সমস্যা দেখা দেয়। আজকের দিনে যা সমস্যা তা আজকের দিনেরই বিশেষ, এক হাজার বছর বা পঁচিশ' বছর বা একশ' বছর আগের সমস্যা তা হতে পারে না। এস্কাইলাসের আমলের সমস্যা এস্কাইলাসের আমলেরই সবিশেষ। তার কাল যে বিশেষ

প্রয়োজন অথবা সমস্যা তার সম্মুখে তুলে ধরে, মানুষ তা মিটাতে বা তার সমাধানেরই চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে। মানুষের এই প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে তার নিজস্ব কালের স্বরূপ বদলায়, নিজের স্বরূপ বদলায়, অবিচ্ছেদ্যভাবেই কাল কালান্তরে, স্বভাব স্বভাবান্তরে পবিণত হয়, বর্তমান ভবিষ্যতেব রূপ পবিগ্রহ করে। তাই, প্রত্যেক যুগে মানুষেব কর্ম যেমন বর্তমানকে রূপায়িত করে তেমনি সৃষ্টি করে ভবিষ্যৎকেও। তাব কর্মের ভিতর দিয়েই এঙ্গেলস্ কথিত নিরন্তর আবির্ভাব-তিরোভাবেব খেলা চলে।

মানুষ যত কিছু ভাব ও যত কিছু কর্মেব মাধ্যমে বর্তমানকে জানার, বোঝার, উপলব্ধি কবাব, উপস্থিত গরজেব তাগিদ মেটানোব চেষ্টা কবে, সাহিত্য ও শিল্পকর্ম তার অন্যতম। মানুষের নিজস্ব সত্তার সামাজিক অস্তিত্বেব একটি দিক। এই কর্ম ও সামাজিক কর্মেব ভিতর দিয়েও মানুষ তাব বর্তমানকে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতকেও সৃষ্টি করে।

তিন

বিবর্তনের স্বরূপও যেমন নিরবচ্ছিন্ন, তেমনি তা বিরোধ বা দ্বন্দ্বময়। অর্থাৎ বিরোধের মধ্য দিয়েই বিকাশ, দ্বন্দ্বের ভিতব দিয়েই বিবর্তন। ভৌতিক, জৈবিক বা যে কোন পদার্থই হোক, তা 'হাঁ' এবং 'না'র সমষ্টি। কিন্তু, এই 'হাঁ' ও 'না' পরস্পর বিরোধী ক্রিয়াশীল শক্তি হ'লেও, বিচ্ছিন্ন নয়; অচেতন বা চৈতন্যময় কোন বস্তুর সংগঠন সম্পর্কেই কখনও হিসেবনিকেশ করে দাগ টেনে বলা চলেনা, এইটে 'হাঁ'এর জমিন, এইটে 'না'-এর; বলা চলে না, এই বিচ্ছেদের সীমারেখার দুপারে দাঁড়িয়ে দু'দলের সৈন্যসামন্ত প্রতীক্ষা করতে থাকে একটি ঐতিহাসিক ক্ষণের, যখন বাঁধবে তাদের লড়াই, আর তারই জয়পরাজয়ের নিষ্পত্তিতে সৃষ্টি

হ'বে এক নতুন পদার্থ। মার্ক্স-এঙ্গেলস্ 'হাঁ'-'না'র এমনি ধবণের যান্ত্রিক বিভাগ স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে 'হাঁ'র মধ্যেই জড়িয়ে আছে 'না', আর 'না'র মধ্যেই 'হাঁ'। তাহলে দেখা যাচ্ছে, এরা যুগপৎ বিরোধধর্মী ও ঐক্যধর্মী। দু'য়ে মিলে সৃষ্টি করে একটি এককে, একটি অখণ্ড, পরিপূর্ণ সত্তাকে; আবার এই দুটি শক্তির বিরোধের ভিতর দিয়েই হয় এই অখণ্ড সত্তার বিকাশ। বিরোধের মধ্য দিয়ে এই অখণ্ড সত্তা অগ্রসর হয় বিকাশের পথে, কিন্তু অগ্রসর হওয়ার পথে (পদার্থের স্বরূপ রূপান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত, গুণগত পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত), প্রতিটি লগ্নে, এই দুই বিরোধী শক্তি বজায় রাখে পারস্পরিক সম্পর্কের ঐক্যকে, পদার্থের সত্তাকে ; তা না হ'লে অরাজকতাময় অনৈক্যের মধ্যে বিকাশ বা বিবর্তন সম্ভব হ'তো না। 'হাঁ-না'র সম্পর্কে ঐক্যধর্মী স্বরূপকে মার্ক্স-এঙ্গেলস্ বলেন dialectical unity.

প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের মাধ্যমে মানুষ সৃষ্টি করেছে তার সমাজ। এই সমাজেব বিবর্তন প্রকৃতি-মানুষ সংঘাতেব উপব যেমন নির্ভরশীল, তেমনি মানুষের সমাজের অন্তর্লীন পবস্পর বিরোধী মানবিক শক্তির বিরোধের উপরও নির্ভরশীল। শ্রেণীবিভক্ত সমাজ তাই অগ্রসব হয় শ্রেণী সংগ্রামের ভিতর দিয়ে। কিন্তু এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হওয়ার পথে, প্রতিটি স্তরে, প্রতিটি মুহূর্তে, বিভিন্ন শ্রেণীসমন্বিত সামাজিক ঐক্য রক্ষিত হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না ঐ ঐক্য কোন এক নূতন গুণসম্পন্ন স্বতন্ত্র ঐক্যে রূপান্তরিত হয়। এই ঐক্য যদি না সংরক্ষিত হ'তো তা হ'লে সমাজ-প্রবাহের যে কোন একটি গ্রন্থিতে এসে মানুষের সমাজ শতধা হ'য়ে টুকরো টুকরো হ'য়ে ভেঙ্গে যেত, প্রবাহ গতিহীন বদ্ধ জলায় পরিণত হয়ে শুকিয়ে মরত।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজে শ্রেণীসংগ্রাম যত তীব্র ও ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে মানবেতিহাসের আর কোন স্তরেই তা কোনকালে হয়নি। এই সংঘাতের মধ্য দিয়ে ধনতান্ত্রিক সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি ক্ষয় ও ধ্বংস হ'য়ে চলেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা, সংস্কৃতি ও প্রতিজ্ঞা নিজেকে সৃষ্টি করে চলেছে; নিজের অস্তিত্বের গরজে ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী সমাজ সমগ্র মানবিক বিশ্বকে ঐক্যসূত্রে বেঁধেছে, কিন্তু সংগে সংগে ধনতন্ত্রবিরোধী সংগ্রামও তীব্রতব হয়েছে। ঐক্যের তাগিদ যতই বাড়ে, সংঘাতেব মুহূর্তও ততই ঘনীভূত হয়; অথবা সংঘাতের মুহূর্ত যতই ঘনীভূত হয়, ঐক্যের গরজ ততই বাড়ে, নূতন রূপান্তরিত সম্পর্কেব, নূতন ঐক্যের পথ ততই সুগম হয়।

আর এই বিরোধ শতচ্ছিন্ন ঐক্যের মধ্যে সমগ্রভাবে মানুষেব সমাজ বিকাশের পথে প্রগতির পথে অগ্রসর হয়; অনিবার্য মৃত্যুর পথে অগ্রসর হতে হতেও ধনতান্ত্রিক সমাজ মানুষকে নতুন শক্তির, নিজেকে জানাব, প্রকৃতিকে জয় করার, নিজেকে প্রতিষ্ঠা করাব শক্তিব সন্ধান দিয়ে যায়। [যেমন, পরমাণবিক শক্তির আবিষ্কার; ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী সমাজের ধাবক ও বিধায়কদেব হাতে এই শক্তি শুধু ধ্বংসের কার্যেই ব্যবহৃত হবে, কিন্তু এই শক্তি ব্যবহার করে যে অসাধ্য সাধন সম্ভব, মানুষের সমাজকে যে বিরাট সম্ভাবনাময় সৃষ্টির পথে সংগঠিত করা সম্ভব, তা সর্বথা স্বীকার্য। তাই এই শক্তির আবিষ্কারটি সামগ্রিক সমাজ বিবর্তনের ইতিহাসে অমূল্য সম্পদ। ধনতন্ত্র-সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তি যতই বল সঞ্চয় করে ততই ধনিক শ্রেণী মারণাস্ত্র আবিষ্কারের জন্য উন্মত্ত হয়, অর্থাৎ সৃষ্টিশীল সমাজতান্ত্রিক প্রতিজ্ঞা বিরোধী ধনতান্ত্রিক

শক্তিকে আত্মরক্ষার মারণাস্ত্র তৈরীতে বাধ্য করে, প্রকারান্তরে ধ্বংসের উপকরণে পরিণত হয়।]

সুতরাং মানুষের সমাজের কথা, সামাজিক সম্পর্কে আবদ্ধ মানুষের কর্মের কথা, যখন আমরা চিন্তা করবো, তখন 'হাঁ'র মধ্যে 'না, না'র মধ্যে 'হাঁ'র অস্তিত্বের কথা, এবং এদের সম্পর্কে গড়া ঐক্যের স্বরূপ সম্পর্কে যেন আমরা বিস্মৃত না হই। সামাজিক রূপান্তরের অর্থ হাঁ-না সমন্বিত ঐক্যের রূপান্তর—হাঁ-না'র নবতর সম্পর্ক স্থাপন ও নতুন ঐক্যস্বরূপ সৃষ্টি। মানুষের সামাজিক কর্ম একটি ঐক্যকে ভাঙ্গে, আরেকটি ঐক্যের জন্ম দেয়। [স্মরণীয় মার্ক্সের উক্তি: Proletariat and riches are contradictions ; as such they form a united whole. লেনিনের উক্তি: Dialectical 'moment' requires an indication of 'unity' ; i. e. of the connection of the negative with the positive, requires the finding of this positive in the negative. From affirmation to negation—from negation to a unity with the affirmation ; without this dialectic becomes a barren negation.... .....]

মানুষ তার নিজের ইতিহাস নিজেই সৃষ্টি করে, কিন্তু সৃষ্টি করে এইরূপ বিচিত্র এবং যুগপৎ বিরোধী ও ঐক্যধর্মী কর্মের মাধ্যমে। এঙ্গেলস্ বলেন, সৃষ্টি করে অচেতনভাবে। কারণ, মানুষের সমাজে প্রত্যেকটি মানুষই তার নিজস্ব ভাবনা ধারণাকল্পনা আশাআকাঙ্খাকে চরিতার্থ করার কাজে ব্রতী হয় ; প্রত্যেক মানুষের কর্মেরই নিজস্ব একটি স্বকীয়তা, গতি বা প্রকৃতি থাকে। ফলে বহু মানুষের স্বকীয়তা, কর্মের গতি ইত্যাদি যখন একই সামাজিক পরিমণ্ডলে ঘুরপাক খায়, তখন সৃষ্টি

হয় আরও বিচিত্র জটিল ও অস্থির এক আবর্ত যা নির্বিশেষ, যা সামগ্রিক হয়েও কোন্ ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অভিলাষ-অনিচ্ছায় প্রভাবিত নয়, যা সকলের হয়েও কারো নয়। এই আবর্তের সহস্রমুখী তরঙ্গের স্বকীয় গতি থেকে, সহস্র পরস্পর বিবদমান ইচ্ছার অভিঘাতে যে নতুন সত্তার আবির্ভাব হয়, তা হয়তো সচেতনভাবে কোন মানুষই কামনা করে না। এঙ্গেলসের কথায় "History makes itself in such a way that the final result always arises from conflicts between many individual wills, of which each again has been made what it is by a host of particular conditions of life. Thus there are innumerable intersecting forces, an infinite series of parallelograms of forces which give rise to one resultant—the historical event. This again may itself be viewed as the product of a power which, taken as a whole, works unconsciously and without volition. For what each individual wills is obstructed by everyone else, and what emerges is something that no one willed."

সমাজের অর্থনৈতিক রূপ, রাষ্ট্ররূপ, ধর্ম, দর্শন, শিল্প-সাহিত্য বা আর যে কোন ভাবরূপ বিশ্লেষণের বেলায় ইতিহাসের প্রবাহ ও ব্যক্তিক কর্মের এই বিচিত্র ধারার বৈশিষ্ট্য সর্বতোভাবে স্মরণযোগ্য।

চার

মার্ক্স-এঙ্গেলসের দৃষ্টিতে সমাজের মূলগত ভিত্তি তার অর্থনৈতিক রূপ, মানুষে মানুষে পারস্পরিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক, অর্থনৈতিক রূপটাই মানুষের সমাজের গোড়াকার সত্য বা তলাকার সত্য (প্রমথ চৌধুরীর ভাষায়)। কিন্তু, মানুষ শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সম্পর্কের সমষ্টি নয়। তার বুদ্ধি, বোধ ও ভাবজীবনও আছে। ভাবজীবনেব সংগে সামাজিক অস্তিত্বের তলাকার সত্যের সম্পর্ক কি তা বিচায।

আদিম সমাজে সম্ভবত মানুষের অর্থনৈতিক উৎপাদনেব জীবন, তার ভাবজীবন, তার স্বন্দরের চেতনা, অনুভূতি ইত্যাদি একই সামাজিক কর্মের মধ্যে অভিব্যক্ত হয়েছে (যেমন ফসল বোনা বা ফসল তোলাব জন্য নকল সামাজিক উৎসব, ইত্যাদি)। কিন্তু সবল জীবনযাপন পদ্ধতি, লক্ষ্যের সরলসহজ গতি, সবল উৎপাদন সম্পর্ক পরিবর্তিত হ'য়ে যখন সমাজ সংস্থায় জটিলতা আসে, সম্পর্ক জটিলতর হয়, তখন একক কোন কর্মের মধ্যে মানুষের সামগ্রিক বাস্তব অর্থনৈতিক ও ব্যাপক ভাবজীবন ব্যঞ্জনা লাভ করতে পারে না—ভাবজীবন বাস্তব কর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এইরূপ জটিল শ্রম ও শ্রেণীবিভক্ত সমাজে ভাবজীবনের সঙ্গে বাস্তব অর্থনৈতিক জীবনের সম্পর্ক কি সে সম্পর্কে মার্ক্স বলেছেন, মানুষেব বাস্তব জীবনযাত্রার উৎপাদন পদ্ধতি 'সাধারণভাবে' সমাজের মানস জীবন নিয়ন্ত্রণ করে। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, মার্ক্স এ কথাটা বলেছিলেন অর্থনীতির আলোচনায়। অর্থনৈতিক উৎপাদন: উৎপাদন পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে গড়ে-ওঠা উৎপাদন সম্পর্ক: সমাজের অর্থ নৈতিক কাঠামো

—এইটে মার্ক্সের মতে সমাজের বাস্তব জীবনযাত্রার ভিত্তি। এই জীবন সাধারণভাবে সমাজমানসকে নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু মনে রাখতে হ'বে, এই নিয়ন্ত্রণ কথাটাকে মার্ক্স বা এঙ্গেলস্ কেউই বলবিদ্যা (Mechanics) বা পদার্থবিদ্যায় যে অর্থ ব্যবহৃত হয় সে অর্থে ব্যবহার করেন নি। করলে তাঁদের 'প্রবাহ' চেতনা, 'হাঁ' 'না'র ডায়লেকটিক স্বরূপ ও মানুষের কর্মের দ্বান্দ্বিক বৈচিত্র্য ইত্যাদি তত্ত্বের মূল কাঠামো আপনাতেই ভেঙ্গে পড়ে। মার্ক্স বা এঙ্গেলস্ কেউ তা করেন নি। মার্ক্স A Critique of Political Economy-তে বলছেন, ইহা সুবিদিত যে সমকালীন সমাজের সাধারণ বিকাশ-ধারা, তার বাস্তব ভিত্তি বা সাংগঠনিক বিন্যাসের সহিত শিল্প-বিকাশের কোন কোন সুউন্নত পর্যায়ের কোনই প্রত্যক্ষ সংযোগ নেই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি গ্রীক শিল্প ও সেক্‌স্‌পীয়র সাহিত্যের কথা বলেছেন। আর এঙ্গেলস্ তাঁর State of Germany প্রবন্ধে অষ্টাদশ শতকের সর্বশেষ পর্যায়ের জার্মান সমাজ-বিন্যাস, রাষ্ট্ররূপ ও অর্থনৈতিক কাঠামোর নিঃসংশয় পচনশীল স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেও বিস্মিত হচ্ছেন জার্মান দর্শন ও সাহিত্যের মাহাত্ম্যে, কেননা, ঐ ক্ষয়-পেয়ে-যাওয়া সমাজ পরিবেশের মধ্যেই আবির্ভাব হয়েছিল গ্যেটে, শিলার, কাণ্ট, ফিক্‌টে ও হেগেলের। সমাজের বাস্তব ভিত্তি যদি আঙ্কিক নিয়মে সমাজের ভাবলোককে নিয়ন্ত্রণ করে তা'হলে পচনশীল সমাজে পচনশীল শিল্পকর্ম ও দর্শন-চিন্তারই আবির্ভাব হওয়া উচিত।

কিন্তু তা হয় না; এটাই সমাজপ্রবাহের ডায়লেকটিক ধর্ম। বাস্তব সামাজিক ভিত্তি ও মানসজীবনের সঙ্গে সম্পর্ক কি, এ প্রশ্নে মার্ক্সের মৃত্যুর পর এঙ্গেলস্ বিভিন্ন মার্ক্সবাদীর নিকট যে সব পত্র

লেখেন তার একটিতে বলছেন, 'অর্থনৈতিক গরজই একমাত্র ক্রিয়াশীল এবং মানুষের জীবনের অন্যান্য দিক শুধুমাত্র একটা অলস অস্তিত্ব বহন করে, তা কখনো সত্য নয়, অর্থনৈতিক গরজের উপর হয় ঐ সব দিকের প্রতিক্রিয়া,...বস্তুবাদী দর্শন বলে, বাস্তব জীবনে মানুষ যা উৎপাদন ও সৃষ্টি ক'রে (production and redroduction) তাই ইতিহাসের গতি নিরূপণ করে। এর থেকে বেশী কিছু আমি বা মার্ক্স কেউ বলিনি।' শুধু তা-ই নয়, এঙ্গেলস্ স্পষ্ট করেই ঘোষণা করেছেন, মানুষের চিন্তা বা ভাবজীবনের গতির নিয়ম প্রকাশভঙ্গীতে বহিঃপৃথিবীর গতির নিয়ম থেকে স্বতন্ত্র। [Laws of motion of human thought differ in expression (in so far as the human mind can apply them consciously) from the laws of motion of external world]. কারণ, মানুষের মনোজীবনের তন্ত্রীতে বেজে ওঠে যেসব ধারণাকল্পনা, ভাবনা, তারা সমাজজীবনের বাস্তব অর্থনৈতিক ভিত্তি থেকে অনেক দূরে সরে যায় এবং এদের পারস্পরিক সম্পর্ক তখন জটিল হয়ে পড়ে, সম্পর্কের মধ্যবর্তী সূত্রগুলি একে অত্যন্ত অস্পষ্ট করে তোলে (Still higher ideologies, such as are still further removed from the material economic basis,......philosophy and religion......here the inter-connection between the ideas and their material condition of existence becomes more and more complicated, more and more obscured by intermidiate links.

এঙ্গেলসের এইসব উক্তি থেকে স্পষ্টতই দেখা যায়, তিনি মানুষের ভাবজীবনের একটু স্বতন্ত্র অন্য-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব স্বীকার করছেন, এর

নিয়ম অন্যসব নিয়মের ব্যতিক্রম, অন্য নিয়মের সাহায্যে এর ব্যাখ্যানও চলে না। বস্তুত, ঐ একই পুস্তকে (লুড্‌উইক ফয়ারবাখ্‌) তিনি খোলাখুলি এও ঘোষণা করেছেন, Every ideology…once it has arisen, develops in connection with given concept-material, and develops this meterial further; otherwise it would not be an ideology, that is occupation with thought as with independent entities and subject only to their own laws.

মনে হয়, মার্ক্সের প্রথম উক্তিটি—বাস্তব অর্থনৈতিক জীবন সাধারণভাবে সমাজের মানসজীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে—এবং মার্ক্স-এঙ্গেলসের পরবর্তী উক্তি পরস্পর বিরোধী। তাহলে মার্ক্স-এঙ্গেলস্ কি তাঁদের নিজের মতবাদকে খণ্ডন করেছেন? প্রশ্নটি অবান্তর, কেননা সেটা কল্পনাতীত।

এই সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের সব সময় মনে রাখা প্রয়োজন, মার্ক্স-এঙ্গেলস্ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সমস্যা আলোচনায় বিভিন্ন উক্তি করেছেন। চোখের সামনে সেই সময়ে যে প্রসঙ্গটা প্রধান ছিল, তার সমাধান ও বিশ্লেষণই ছিল তাঁদের কাম্য। সেজন্যই প্রসঙ্গের গুরুত্ব ও সময় অনুযায়ী কখনও এদিকে কখনো বা ওদিকে জোর পড়েছে। একথা মনে না রেখে, এবং মার্ক্সবাদের মূল দার্শনিক ভিত্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করে যদি কোন উক্তির বিচার করা হয়, তাহলে মার্ক্সের বিভিন্ন সময়কার বিভিন্ন উক্তির মধ্যে স্ব-বিরোধ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর নয়; সেক্ষেত্রে তাঁর মতবাদের বিকৃত ব্যাখ্যাও সম্ভব।

তাঁদের সমাজচিন্তার ডায়লেকটিক স্বরূপ অবলম্বন করে সমস্যার সমাধান খুব সহজেই করা চলে। কোন ব্যক্তিমানসে যখনই কোন ভাব

বা ধারণা অঙ্কুরিত হ'য়ে ওঠে, এবং যখন ঐভাব কোন মাধ্যমকে অবলম্বন করে শিল্পকর্মরূপে বা দার্শনিক তত্ত্বরূপে প্রকাশিত হয়, তখন তা একটি স্বতন্ত্র সত্তা বা অস্তিত্ব অর্জন করে। যা ছিল শিল্পী বা দার্শনিক মনের একান্ত আপনার নিজস্ব বা subjective, তা সর্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য বস্তুতে পরিণত হয়; তখন তা শিল্পীর ব্যক্তিগত সত্তার বাইরে objective জিনিস। আমাদের ইন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ বস্তু-জগতের অস্তিত্ব যেমন আমরা স্বীকার করি, তেমনি স্বীকার করতে হয় অভিব্যক্ত ভাবকে। আমরা যেমন দেখতে পাই একটা গাছকে, পাথরকে তেমনি দেখতে পাই কবির কাব্যকে, কাহিনীকারের কাহিনীকে, দার্শনিকের বৈজ্ঞানিকের চিন্তাধারাকে। বস্তুজগৎ যেমন তার নিজস্ব নিয়মে প্রবাহিত হয়, এই বিষয়গত-অস্তিত্ব-অর্জন-করা ভাবও তখন স্বনিয়মে বিবর্তিত হতে থাকে।

সমাজপ্রবাহে মনোজাত ভাব বা আইডিয়া এমনি ভাবে বিষয়গত সত্তা অর্জন করার পর এই ভাবও কোন না কোন ভাবে সমাজবিন্যাসকে নিরূপিত করে। তখন বাস্তব জীবন ও ভাবলোকের ভিত্তিতে গড়া বিশেষ একটি ঐতিহাসিক কালের পরিচয় এইরূপ দাঁড়ায়:

অর্থনৈতিক উৎপাদন—উৎপাদন পদ্ধতির ভিত্তিতে গড়ে-ওঠা সামাজিক সম্পর্ক—অর্থনৈতিক কাঠামো বা বাস্তব ভিত্তি (মানুষের কর্ম ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে এক দিকে ধ্বংস-হতে-থাকা পুরানো সম্পর্ক, আরেকদিকে সৃষ্টি-হতে-থাকা নতুন সম্পর্ক); আইন, দর্শন, ধর্ম, বিজ্ঞান, শিল্পসাহিত্য ইত্যাদির ভিত্তিতে গড়া সমাজের ভাবরূপ, (মানুষেরই চিন্তা ও নব নব শিল্পকার্যের মাধ্যমে একদিকে ধ্বংস-হয়ে-চলা পুরানো ভাবরূপ, আরেকদিকে সৃষ্টি-হতে-থাকা নতুন ভাবধারা)।

বাস্তব সামাজিক সম্পর্কের হাঁ-না এবং সামাজিক মানসজীবনের হাঁ-না'র তরঙ্গে সৃষ্টি হয় জটিল সামাজিক আবর্ত, আর নতুন সম্পর্কের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে, প্রায় সমান্তরালভাবে এঙ্গেলসের কথায় nearly parallel, আবির্ভূত হয় নতুন ভাবাদর্শ। হাঁ-না'র বিরোধের স্রোতে প্রবাহিত হয়ে হয়ে কাল কালান্তরে পরিণত হয়। এই নতুন কালের পরিচয়:

পূর্বতনকালের সৃষ্টি-হ'তে-থাকা অর্থনৈতিক উৎপাদন পদ্ধতি ও সম্পর্কের পরিপূর্ণতা: ঐ কালের সৃষ্টি-হতে-থাকা ভাব ও আদর্শের পরিপূর্ণতা। হাঁ-না সমন্বিত রূপান্তরিত এক নতুন ঐক্যের প্রতিষ্ঠা।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সমাজ প্রবাহের পথে নতুন অর্থনৈতিক কাঠামো, সম্পর্ক ইত্যাদি যেমন সহজ স্বাভাবিক নিয়মে আত্মপ্রকাশ করে বা রূপ নেয়, তেমনি নতুন ভাবজীবনও স্বাভাবিক নিয়মে রূপ নেয়। প্রথমে নতুন অর্থ-নৈতিক বিন্যাসের আবির্ভাব, তারপরে ভাবাদর্শের আবির্ভাব—অবস্থাটা কখনও এই ধরণের যান্ত্রিক নয়; বরং নিজ নিজ গতিপথে, নিজস্ব নিয়মে অগ্রসর হ'তে হতে স্বীয় পরিধিতে এরা পূর্ণতা লাভ করে; এই পূর্ণতা অর্জনের পথে পারস্পরিক ঘাতপ্রতিঘাত হয় বিস্তর, পারস্পরিক প্রভাব বিনিময়ও হয় বিস্তর। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের মতো কোন যন্ত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ করলে ভাবপ্রবাহের মধ্যে, খুব ক্ষীণভাবে হলেও, দেখা যাবে অর্থনৈতিক জীবনপ্রবাহের স্রোতরেখা, আবার অর্থনৈতিক জীবন-প্রবাহের মধ্যেও দেখা যাবে ভাবজীবনের প্রবাহের স্পর্শ। বাস্তব অর্থ-নৈতিক জীবন ও সমাজমানস পরস্পর সম্পৃক্ত; মার্ক্স যদি কোন অর্থে নিয়ন্ত্রণ শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন তো একমাত্র এই অর্থেই, অন্য কোন অর্থে নয়।

আর পরস্পর সম্পর্কিত হয়েও স্বতন্ত্র গতিতে, স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে, নিজস্ব নিয়মে, মানুষের বাস্তব ভৌতিক জীবন ও ভাবজীবন বিকাশলাভ করে বলেই এদের গতির রূপ এক নয়, আর স্বতন্ত্র বলেই এঙ্গেলসের ভাষায় মানুষের ভাবনা-কল্পনা-ধারণা ইত্যাদি independent entities. এই দুই ধারার সমন্বয়েই গড়ে ওঠে এককভাবে মানুষের জীবনপ্রবাহ, সমষ্টিগত ভাবে সমাজপ্রবাহ।

পাঁচ

মানুষের চৈতন্য ও জ্ঞানের বিকাশ সম্পর্কে মার্ক্স এঙ্গেলস যা বলেছেন, দর্শনের ইতিহাসে তা' অভিনব, যুগান্তকারী। তাঁরাই মাটির সম্পর্কহীন আকাশচারী দর্শনকে বাস্তব পৃথিবীর মাটিতে মানুষের কর্মের মধ্যে স্থাপন করেন। মানুষ তার কর্মের মাধ্যমে জানে প্রকৃতিকে আর এই জানা রূপ কর্মের মধ্য দিয়েই তার চৈতন্যের, জ্ঞানের বিকাশ। মানুষের অস্তিত্ব-নিরপেক্ষ প্রকৃতি বর্তমান বলেই, এই প্রকৃতির বুকে সে নিরন্তর রূপান্তর সাধন করে বলেই, তার ইন্দ্রিয়ের বিকাশ হয়, হয় তার দৈহিক বৃত্তির, অনুভূতি-কল্পনা অনুরাগ ইত্যাদি মানসিক বৃত্তির বিবর্তন। মার্ক্সের কথায়,—

For not only the five senses but also the so-called intellectual and practical senses (will, love, etc), in a word *human* senses and the humanity of senses, come into being as a result of the existence of *man's* object, as a result of humanised nature.

এই জানার কর্মের মাধ্যমে যেমন তার ইন্দ্রিয় বিকশিত হয়ে চলেছে, তেমনি এই কর্মের ভিতর দিয়ে প্রকৃতিও প্রতি মুহূর্তে মানুষের ইন্দ্রিয় সম্পর্কের মধ্যে ধরা পড়ছে,—প্রকৃতি মানবিক গুণে পরিমণ্ডিত হ'য়ে সমৃদ্ধ রসগর্ভ মাধুর্যে বিকশিত হচ্ছে। আর ঐ একই কর্মের প্রবাহের পথে মানুষের আদিম অপরিমার্জিত ইন্দ্রিয়গুলি পরিমার্জিত হ'য়ে সুন্দর সুষ্ঠু স্পর্শ-চঞ্চল হয়ে বিবর্তিত হ'চ্ছে। মানুষ কিছুতেই নিজেকে সৃষ্টি করতে বা তার জীবনকে নব নব আলোক ও সত্যের পথে অগ্রসর করতে পারতো না যদি না মানুষের জ্ঞান ও কর্মের বিষয় (object) প্রকৃতির অস্তিত্ব থাকতো।

তা'হলে দেখা যাচ্ছে, মানুষ প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপেই বিকাশ লাভ করেছে। কিন্তু প্রকৃতির অন্তর্গত হ'য়েও সে তার বাইরে ; কেননা, প্রকৃতি তার কর্মের বিষয়, তার চৈতন্য ও জ্ঞানের অন্তর্গত। মানুষ-প্রকৃতি—এই দুইটি (অবিচ্ছেদ্য হয়েও স্বতন্ত্র) সত্তা মিলে সৃষ্টি করে একটি অখণ্ড সত্তাকে ; প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে মানুষ সত্য নয়, মানুষকে বাদ দিয়ে প্রকৃতিও সত্য নয় ; মানুষের মন ও প্রকৃতি-পরিবেশ মিলে একটি সৃষ্টিশীল বিকাশমান ঐক্য বা এক তৈরী হয়, আর এই এক-ই ঐ দুয়ের পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাত ও প্রভাবের মধ্য দিয়ে নব নব সত্য ও স্বরূপের পথে অগ্রসর হয়। সুতরাং মানুষের কথা যখন আমরা চিন্তা করবো, বা তার কোন কর্মের রূপ সম্পর্কে যখন আলোচনা করবো, তখন প্রকৃতি-মানুষ মিলে গঠিত সামগ্রিক ঐক্য বা অখণ্ড পরিবেশকে পটভূমিতে সংস্থাপন করেই তা করতে হবে, নইলে মানুষ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ থেকে যেতে বাধ্য।

মানুষের জ্ঞান ও কর্মের মাধ্যমে প্রকৃতি মানবিক সম্পর্কের মধ্যে

আকৃষ্ট হয় ; অর্থাৎ নিজস্ব ব্যক্তিগত সত্তাব সীমানায় আবদ্ধ মানুষ প্রকৃতিকে জানার কর্মের ভিতর দিয়ে নিজের সত্তাকে ব্যাপকতর করে, নিজেব অস্তিত্বের পরিধি বাড়ায়। তাই যত বেশী করে সে জানবে প্রকৃতিকে, ততবেশী সে উপলব্ধি কববে নিজেকে, ততবেশী ব্যাপক ও মহিমময় করবে সে তার অস্তিত্ব ও ব্যক্তিগত সত্তাকে। সুতরাং প্রকৃতিকে জানা-রূপ কর্মেব আরেক নাম মানুষের নিজেরই সত্তা ও অস্তিত্বকে ব্যাপকতর করা। এই ব্যাপকতর হওয়ার বা জানার কর্ম মানুষকে ক্ষুদ্র থেকে মহত্তর, সঙ্কীর্ণ থেকে বৃহত্তর গণ্ডীতে স্থাপন কবে তাকে সর্বগত করে, তাকে ব্যক্তি (individual) থেকে সার্বিক সত্তায় (universalএ) পরিণত করে। এইভাবে সর্বগত বা universal হওয়া মানুষেব কর্ম ও অস্তিত্বেব একটি মূল সহজাত সত্য।

প্রকৃতিব সঙ্গে মানুষের ঐক্য বা তার সর্বগত হওয়ার প্রেবণা সার্থক ভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে মানুষেব সমাজে। মার্ক্সের কথায় ঃ

Only here has (man's) natural existence become human existence and nature has become man for him. Society therefore is the complete essential unity of man with nature, the true resurrection of nature, the completed naturalism of man and the completed humanism of nature.

মানুষের দুটি রূপ—সহজ বা প্রাকৃতিক রূপ (মানুষ প্রকৃতির অঙ্গ), আবেকটি (প্রকৃতির সহিত সংগ্রামের ভিতর দিয়ে বিকশিত) মানবিক রূপ , প্রকৃতিরও তাই দুইটি রূপ—সহজ রূপ, আর (মানুষের কর্মেব বিষয় বলে) মানবিক রূপ। প্রাকৃতিক মানুষ ও মানবিক প্রকৃতির

সুসমন্বিত ঐক্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, মানুষের সমাজ। মানুষের সমাজের বিবর্তন ও বিকাশের অর্থই তাই প্রাকৃতিক মানুষ ও মানবিক প্রকৃতির ঐক্যবদ্ধ সত্তার বিকাশ, মানুষেব সর্বগত সত্তার বিকাশ। মানুষেব জীবন যতই নানাবিধ বর্ণসমারোহ বৈচিত্র্য ও সম্পর্কেব মধ্যে অভিব্যক্তি লাভ করে, ততই তার মানবিক বোধ বিকাশ লাভ কবে, মানুষ বিশ্বজনীন হয়, বিশ্বব্যাপৃত মানুষের খণ্ড খণ্ড সমাজ ঐক্যবদ্ধ হয়।

সামাজিক সম্পর্কে আবদ্ধ মানুষেব কর্ম—অর্থনৈতিক উৎপাদন হোক, শিল্পকর্ম হোক, সাহিত্য বা অন্য যে কোন কর্ম হোক—সর্বগত হওয়ার কর্ম (man Produces universally)। সমাজের অন্তর্গত শিল্পী নিজেকে সমাজ ও প্রকৃতির সমবায়ে গঠিত পরিবেশের মধ্যে সংস্থাপিত দেখতে পান ; একদিকে সমাজ প্রকৃতিব পারস্পরিক সম্পর্কে গড়া পরিবেশ, আবেক দিকে শিল্পীর ব্যক্তিগত সত্তা—শিল্প-সাহিত্যেব ক্ষেত্রে এই দু'য়ে মিলে গঠিত হয় একটী সৃষ্টিশীল ঐক্য। সর্বগত হওয়া যেহেতু মানুষেব অস্তিত্বের মূলকথা, শিল্পকর্মের মাধ্যমে শিল্পীও তাই সর্বগত হন, সমাজ-প্রকৃতি পরিবেশের মধ্যে নিজেকে পরিব্যাপ্ত করেন, নিজের সত্তার ক্ষুদ্র সীমানা থেকে বৃহত্তর সম্পর্কের মধ্যে মুক্তিলাভ করেন। শিল্পোৎপাদনের মাধ্যমে শিল্পী নবতব সামজিক সম্পর্কে আবদ্ধ হন, তার আত্মগত ভাবসম্পদ সর্বগত সামাজিক শিল্পসম্পদে পরিণত হয়। এর মাধ্যমে তিনি যেমন সৃষ্টি করেন নিজকে তেমনি ইংগিত দেন সমাজের নবতর রূপান্তরের। সৃষ্টির মধ্য দিয়ে মানুষের সামাজিক অস্তিত্ব ব্যাপক হয় পরিব্যাপ্ত হয়, আর তার অপরিমার্জিত ইন্দ্রিয় মার্জিত, বোধ পরিপূর্ণ, শুদ্ধ ব্যক্তি ভাবভাবনা মানবিক দরদে পরিণত হয় ; জীবন ও প্রকৃতির সীমাহীন বৈচিত্র্য,

রং-রস ভরা মাধুযের সৌষ্ঠবে গড়ে ওঠে মানবিক বোধ। মার্ক্সের কথায় :

Objectivization of human existence, both in a theoretical and practical way means making man's *senses human* as well as creating, human senses corresponding to the vast richness of human and natural life.

অর্থাৎ শিল্পকর্মের লক্ষ্যই তাই মানুষের বোধশক্তিকে তার অনুভূতিকে মানবিক সংবেদনশীলতায় সত্য ও সমৃদ্ধ করে তোলা—জীবন ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সীমাহীন বৈচিত্র্য ও সৌষ্ঠবের সঙ্গে সঙ্গতি-রেখে মানবীয় বোধ সৃষ্টি করা, সংবেদনশীলতাকে সজীব করে তোলা। এই মানবিক বোধই শিল্পকে মহত্ত্ব দেয় ; এই গুণের জন্যই এঙ্গেলস্ গ্যেটেকে মহৎ বলে স্বীকার করেন ; বলেন : এই মানদণ্ডে তিনি শেক্স-পীয়র থেকেও বড়। এই অর্থেই মার্ক্স-এঙ্গেলসের দৃষ্টিতে শিল্পসাহিত্য মানবধর্মী।

ছয়

মার্ক্স বলেন, শিল্পসাহিত্য, তাই, ব্যবসা (business) নয়। তাঁর মতে, কোন শিল্পীই তার সাহিত্যকে আর কোন লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার উপায় বলে মনে করেন না ; শিল্পই শিল্পের সার্থকতা, আর সেটা এতো বেশী যে শিল্পী তার সমস্ত অস্তিত্বকে শিল্পের বেদীমূলে উৎসর্গ করে দেন ; তাঁর আদর্শ হ'লো, উপস্থিত সংঘাতের দোলায়

আন্দোলিত মানুষের নির্দেশ মানা নয়, নির্দেশ মানা তার অন্তর্লীন প্রেরণার যে প্রেরণা তাকে নিরন্তর সৃষ্টির বেদনায় চঞ্চল করে তুলছে, যে প্রেরণা তাকে নবতর স্বভাবের মধ্যে বৃহত্তর মানবিক স্বভাবের মধ্যে, মুক্তিলাভের জন্য উদ্বেল করে তুলছে।

(The writer in no way regards his works as a *means.* They are *ends in themselves* ; so little are they a means for him and others that, when necessary, he sacrifices *his* existence to *theirs*, and like the preachers of religion he makes his principle : "Obey God more than men" men among whom he is himself included along with his human needs and desires.)

মার্ক্সের এই উক্তিটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা এতে শিল্পী মানসের মূল প্রেরণা সম্পর্কে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেন একজন মানুষ শিল্প-কর্মে উদ্বুদ্ধ হয়, কেন আরেকজন হয় না বা হতে পারে না, তা উপলব্ধির মধ্যে শিল্পকর্মের বৈশিষ্ট্য নিহিত রয়েছে। শিল্পী মানসে যখন কোন ভাব অঙ্কুরিত হয়, তখন ধীরে ধীরে তা শিল্পীর সত্তাকে ব্যাধির মত অভিভূত করে ফেলে ; তার ভাব-সত্তা তার ব্যক্তিসত্তাকে সম্পূর্ণভাবে পরিব্যাপ্ত করে ফেলে। এই ব্যাধির প্রকোপ থেকে কোনোমতেই মুক্তি নেই, যদি না তা ব্যক্ত হয়, প্রকাশ পায়, আর সব মানুষের অভিজ্ঞতার মধ্যে ব্যাপ্ত হয়। এটা সব শিল্পীরই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। শিল্পকর্মের প্রেরণাও তাই। রলাঁ কেন লেখি এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, না লিখে পারি না তাই। এ সম্পর্কে ইয়ুং-এর একটি উক্তি প্রণিধান যোগ্য ; তিনি বলেন, শিল্পকর্ম,

"is the maternally creative side of the masculine spirit...Art is a kind of innate drive that seizes a human being and makes him its instrument. The artist is not a person endowed with free will who seeks his own ends, but one who allows art to realise its purpose through him. As a human being he may have moods and a will and personal aims, but as an artist he is "man" in a higher sense—he is "collective man"—one who carries and shapes the unconscious, psychic life of mankind. To perform this difficult office it is sometimes necessary for him to sacrifice happiness and everything that makes life worth living for the ordianary human being."

মার্ক্সের চিন্তাধারা ও ইয়ুং-এর চিন্তাসূত্রের মধ্যে আশ্চর্য ঐক্য দেখা যাচ্ছে ; শিল্পী নিজেব সুখদুঃখ অস্তিত্ব সমস্ত কিছু বিসর্জন করে দেয়, এ কথা ইয়ুংও বলছেন। কার কাছে এই আত্মসমর্পণ?—সেই প্রেরণার কাছে, যে প্রেবণা শিল্পী-মানসকে যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে উপলব্ধি করে নিজেকে। শিল্পী-মানসে অবির্ভূত হওয়া ভাবের প্রেরণার সঙ্গে শিল্পী একাত্মভাবে মিশিয়ে দেন নিজের সত্তা ; ছেদহীন, ব্যবধানহীন এই মিলন। সেজন্যই একটি কবিতা কি, একটি গান কি, একটি কাহিনী কি—তার পরিচয়ে বলা হয়, কবি বা গায়ক বা কাহিনীকার ঐ ভাবের আঘাতে যা হয়েছেন, অথবা যা হতে চেয়েছেন। সমাজের অন্তর্গত আর সব মানুষের অনুভূতি-গ্রাহ্য রূপ নিয়ে প্রকাশ

হওয়ার পথে ঐ ভাব শিল্পীরও রূপান্তর ঘটায় ; ইয়ুং-এর ভাষায় শিল্পী উন্নত ধরণের মানুষ, collective man। মার্ক্স মানুষের সংজ্ঞায় বলেন, a real individual collective being। এই সংজ্ঞা শিল্পীদের সম্পর্কে যত সত্য, আর কোন মানুষের পক্ষে বোধ হয় তত সত্য নয়।

বলা বাহুল্য, শিল্পী প্রেরণায় অনুপ্রাণিত নয়, এমন কোন মানুষকে ফরমায়েস দিয়ে শিল্পীতে পরিণত করা যায় না। তা যদি করা যেত তাহলে যেকোন মানুষের পক্ষেই শেক্সপীয়র-গ্যেটে-টলষ্টয়-রবীন্দ্রনাথ হওয়া সম্ভব হতো। ফরমায়েসী শিল্পকর্ম সম্পর্কে মার্ক্স বিদ্রূপ করে বলেছেন,

On the other hand, imagine a tailor, from whom I order a Parisian frock coat, bringing me a Roman toga because it is more in accord with the external law of the beauiful ! *The first freedom of the press consists in its not being a business.*

শিল্পীর আদর্শ বলার মত, না লিখে পারি না তাই লিখি। শিল্পীর দেহের সমস্ত অনুপরমাণুকে পরিব্যাপ্ত করে বিরাজ করে যে প্রেরণা, তা-ই তাকে নিরন্তর উদ্বুদ্ধ করে তুলছে সৃষ্টিকর্মে, তাগিদ দিচ্ছে কিছু হওয়ার জন্যে। তার ধর্মই নয় কোন ফরমায়েসের অপেক্ষায় বসে থাকা। তাকে বলে দিতে হয় না, তুমি বাস্তব সামাজিক পরিস্থিতি দ্বারা উদ্বুদ্ধ হও, রাজনৈতিক সংগ্রামে অনুপ্রাণিত হও, ধনতান্ত্রিক সভ্যতার পচনশীলতার মুখোস খুলে ধর, সমাজতন্ত্রের ওকালতি কর। তার প্রেরণার গরজেই সে সমাজ-মানসের তরঙ্গে উদ্বুদ্ধ হয়ে চলেছে,

আর বাস্তব পরিবেশকে জানার মধ্য দিয়ে যেহেতু মানুষের জ্ঞান ও চৈতন্যের বিকাশ, সেইহেতু শিল্পীর শিল্পকর্মও বাস্তব পরিবেশকে আশ্রয় করেই বিবর্তিত হয়। সমাজের বাস্তব জীবন, এর বিবর্তিত হতে-থাকা রূপ, শিল্পীর ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত তার চৈতন্যে আঘাত করছে। সেই জাগরণের চাঞ্চল্যেই শিল্পীকে শিল্পকর্মে হাত লাগাতে হয়; সত্যিকারের শিল্পীকে তা না করে উপায় নেই। শিল্পকর্মই তার জীবন। অথচ, শিল্প-প্রেরণার মূল উৎসের বৈশিষ্ট্য বিস্মৃত হয়ে ফরমায়েসী চাল চালতে গিয়ে কত প্রতিভাবান শিল্পীর যে অপঘাত-মৃত্যু হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই; আর শিল্পী এবং শিল্প কর্ম এতে নিন্দিত হয়েছে।

শিল্পী-মানসের সেই অন্তর্লীন প্রেরণা প্রকাশলাভের বেদনায় শিল্পীকে উদ্বুদ্ধ করে, অথচ, আশ্চর্য এই, সেই প্রেরণার প্রকাশটাও নির্বিরোধ নয়। যে মাধ্যমকে আশ্রয় করে তা অভিব্যক্ত হবে তার প্রতিরোধ, শিল্পীর চেতন মনের অর্থাৎ সামাজিক ঐতিহ্য, ধ্যানধারণা ও শিল্পের নিজস্ব প্রচলিত গঠন-বৈচিত্র্যের প্রতিরোধ সেই ভাবের প্রকাশপথকে অবরোধ করে দাঁড়ায়। এই প্রতিরোধ অতিক্রম করেই তবে ভাব ব্যঞ্জনালাভ করে, ফোটা-ফুলের সৌষ্ঠব নিয়ে ব্যক্ত হয়। শিল্পী-মানসেও তাই হাঁ-না'র দ্বন্দ্ব, তার মনের অবচেতন ও চেতন রূপের সংঘাত। এই সংঘাত আবার শিল্পীমনের বাইরের জগতের— সমাজ ও প্রাকৃতিক পরিবেশ—সংঘাতের সঙ্গে ঐক্যবন্ধনে বাঁধা; কারণ, পূর্বেই বলেছি, মনকে বাদ দিয়ে যেমন পরিবেশ সত্য নয়, তেমনি পরিবেশকে বাদ দিয়ে মনও সত্য নয়। প্রতিরোধ পার হয়ে শিল্পীর মনোজাত ভাব বাস্তব জীবন পরিবেশের সঙ্গে কোন এক

স্তরে সংযোগ, কোন এক স্তরে বিয়োগের সম্পর্কে আবদ্ধ হ'য়ে হ'য়ে বিবর্তিত হয়। শিল্পীর মানস-দ্বন্দ্ব তাই এতো বিচিত্র, এতো জটিল, এতো বেদনাদায়ক। সেইজন্যই দেখা যায় অঙ্কুরিত হওয়ার প্রথম লগ্নে ভাবের যে রূপ আর সর্বজন-গ্রাহ্য হ'য়ে যে ভাব প্রকাশিত হয়, তাঁর মধ্যে দুস্তর ব্যবধান; যা কামনা করা হয়নি, যা ছিল অনভিপ্রেত, অজানা তাই সংবেদনশীলতায় সমৃদ্ধ হয়ে মানুষের অনুভূতির তন্ত্রীতে সুর জাগায়, মানুষকে সমাজ-প্রকৃতি পরিবেশ সম্পর্কে জাগ্রত করে, নবতর সম্পর্কে মানুষ উপলব্ধি করে নিজের সত্তাকে। এই ভাবরূপ থেকে প্রকাশরূপে বিবর্তনের প্রবাহেও এঙ্গেলস্ কথিত ঐতিহাসিক প্রবাহের বৈচিত্র্য—যা আবির্ভূত হয় তা কারও অভিপ্রেত নয়, what emerges is something that no one willed.

মানুষ শুধুমাত্র সমাজ-পরিবেশের মধ্যে বিচরণ করে না, সমাজ পরিবেশেরও বৃহত্তর পরিবেশ আছে—প্রাকৃতিক পরিবেশ; সুতরাং শিল্প কর্মের পরিধি সমাজ পরিবেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, সমাজ-প্রকৃতি পরিবেশের মধ্যে বিস্তৃত। এই সুবৃহৎ পরিবেশ থেকেই সংগৃহীত হয় অপরূপ বর্ণসমারোহ, যা কোনরূপ স্থিতিশীল নির্জীব সম্পর্কের সমবায় নয়, সজীব সৃষ্টিশীল প্রবাহ। এই প্রকৃতি পরিবেশ মানুষের অস্তিত্ব, জ্ঞান-চৈতন্য, তার সত্তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হওয়া সত্বেও উপস্থিত অর্থ-নৈতিক গরজের তাগিদ বলতে আমরা যা বুঝি তার পরিধির বাইরে। শিল্পকর্ম মানব ইতিহাসের বিবর্তনের এই স্তরে মূল অর্থনৈতিক ভিত্তি থেকে বহু দূরে সরে গিয়ে প্রায় সমান্তরাল গতিতে প্রবাহিত হয় বলে এবং শিল্প প্রেরণা কোনরূপ গরজের অপেক্ষা রাখে না বলে, প্রত্যক্ষ প্রয়োজনের মানদণ্ডে তার বিচার হয় না। অর্থনৈতিক জীবন

মানুষের সামগ্রিক জীবন প্রবাহের একটি দিকমাত্র ; অবশ্য, তা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দিক। এমন সব কর্ম, এমন সব অভিব্যক্তি, এমন সব স্বর এই প্রবাহের অন্তর্গত যা অর্থনৈতিক গরজের বিচারে অকারণ, কিন্তু বোধ-অনুভূতি-সংবেদনশীলতা ও মানবিকতাকে সমৃদ্ধ করার বিচারে যা অপরিহার্য। মানুষের বহুবিধ কর্মের এই সামগ্রিক রূপ সম্পর্কে মার্ক্স-এঙ্গেলস সর্বদা সচেতন ছিলেন, জীবনের অখণ্ডতাকে কোনকালেই তাঁরা কোন একটি একক ধারার (যেমন অর্থনৈতিক) মানদণ্ডে খণ্ডিত করেননি। মার্ক্স সেজন্যই স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন, men produces independently of physical needs and really produces only when free of these needs..........man also creates according to the laws of beauty.

মানুষ সৃষ্টি করে তখনই যখন সে জৈবিক গরজের তাগিদের ঊর্ধ্বে, মানুষ সৃষ্টি করে সুন্দরের নিজস্ব নিয়ম অনুসারে, নিজস্ব ভংগীতে। [তুলনীয় শিলারের উক্তি : man is completely human only when he is playing.]

সুন্দরের প্রসংগ থেকেই শিল্প সাহিত্যের দেহরূপের প্রশ্ন আসে। শিল্পীর মনোজাত ভাব বিশেষ একটি রূপ ধরে প্রকাশিত হয় ; ঐরূপটি ভাবের দেহ, ভাব ঐ দেহের অন্তর্গত সত্তা। এই দুয়ের একাত্ম মিলনে প্রকাশিত হয় একটি অখণ্ড সত্য, ভাব দেহরূপ নিয়ে অন্য মানুষের অনুভূতিতে সত্য হয়ে বিকশিত হয়। সুতরাং দেহসৌষ্ঠব ভাবের মূল্যমানকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত করে ; তাই প্রকাশের পথে রূপের কাঠামোকে পরিপূর্ণভাবে জয় করে, কাঠামোর রন্ধ্রে নিজেকে সঞ্জীবিত করে তার রূপান্তর ঘটিয়ে তবে ভাব-রূপ এক হয়ে প্রকাশিত

হয়; দ্বন্দ্বের ভেতর দিয়ে হাঁ-না'র বিরোধ মীমাংসিত হয়ে নতুন এক ঐক্যের আবির্ভাব হয়। মানুষ রসাস্বাদন করে এই সামগ্রিক ঐক্যের। মানুষ যা কিছু বলুক বা করুক তা কখনও অন্য মানুষের হৃদয়কে অনুভূতিকে স্পর্শ করবে না যদি না তা সুন্দররূপে অভিব্যক্ত হয় যদি না তা ভাব ও রূপের পরিপূর্ণ ঐক্য ও সঙ্গতির মধ্যে প্রকাশিত হয়। উদগ্রভাবে শ্রেণীসংগ্রাম ও সমাজতন্ত্রের কথা প্রচার করা সত্ত্বেও কোন কোন লেখক কেন শিল্পীর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন না তার সন্ধান বোধ করি এইখানেই মিলবে।

সাত

মাধ্যমের প্রতিরোধ, চেতন অবচেতনের দ্বন্দ্ব, প্রচলিত শিল্প-রীতি ও ভাবের বিরোধ প্রকাশিত হাওয়ার আগে শিল্পী মানসের এই বিরোধে আন্দোলিত বৈচিত্র্য ছাড়াও প্রকাশিত ভাব-রূপের বা সাধারণভাবে শিল্পকর্মের আরও একটি বৈশিষ্ট্য বর্তমান। রূপ থেকে রূপান্তরে অর্থাৎ বিপ্লবের ভেতর দিয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হ'য়ে চলেছে মানুষের ইতিহাস; ইতিহাসের গতির, ইহাই সাধারণ, পরম, নির্বিশেষ রূপ। মানুষের কর্ম (শিল্প-সাহিত্য কর্মও তার অন্তর্গত) যা ইতিহাসকে প্রবাহিত রাখে তারও তাই একটি পরম, নির্বিশেষ রূপ আছে। কারণ, তা ইতিহাসের নিরবচ্ছিন্ন চলার, গতির, অন্তর্গত। কারণ মানুষের কর্মই সমাজ-ইতিহাসের নিরবচ্ছিন্ন গতিকে অব্যাহত রাখে। কিন্তু কোন বিশেষ কালের সীমার মধ্যে যখন ইতিহাসকে, গতিকে, মানুষের কর্মকে স্থাপন করি, তখন সেই নির্বিশেষ (ইতিহাস-গতি-

কর্ম) বিশেষ (ইতিহাস-গতি-কর্ম)-এ পরিণত হয়। যেমন, ধনতান্ত্রিক সমাজের ইতিহাস, গতি বা মানুষের শিল্পকর্ম পরম (absolute) নির্বিশেষ সমাজ প্রবাহের অন্তর্গত কিন্তু, তা সত্ত্বেও এর একটা বিশেষ রূপ আছে, কারণ, তা এই কালের এই যুগের নিজস্ব। অথবা এই বিশেষ কালের নিজস্ব হওয়া সত্ত্বেও তা এই কালের পরিধির বাইরে, কারণ, তা নির্বিশেষের অন্তর্গত। শিল্পকর্ম তাই বিশেষের মধ্যে নির্বিশেষকে রূপ দেয়, আপেক্ষিকের মধ্যে পরমকে প্রকাশ করে। তাই কোন বিশেষ যুগের সাহিত্য বা শিল্পকর্ম সম্পর্কে যখন আমরা বিচার করবো, তখন কতখানি তা এই যুগবিধৃত আর কতখানি তা পরম সমাজ প্রবাহের অন্তর্গত, তা নিরূপণ করতে হ'বে ; অথবা যুগবিধৃত হ'য়েও তা কেন যুগসীমার বাইরে, সমগ্রভাবে তার বিচার করতে হ'বে, অর্থাৎ বিশেষে নির্বিশেষ মিলিত হ'য়ে সৃষ্টি হয় যে অখণ্ডতা তার পরিচয় চাই।

ব্যাপক সমাজ প্রবাহের ক্ষেত্রে এই বিশেষের মধ্যে নির্বিশেষের রূপায়ণের বৈশিষ্ট্য ছেড়ে দিয়ে আরও স্থূল দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাক। যেমন, গল্পে-কাব্যে নাটকে বা উপন্যাসে রূপায়িত কোন শ্রমিক। সমাজের অন্তর্গত মানুষ হিসাবে তার একটি ব্যক্তিরূপ আছে যা তারই একান্ত একলার বিশেষ রূপ ; কিন্তু তার শ্রেণীরূপও আছে, সেখানে সে সারা দুনিয়ার শ্রমজীবী জনসাধারণের প্রতিভূ—নির্বিশেষ রূপ। তার বিশেষ এবং নির্বিশেষ রূপের মিলিত ঐক্যই তার পূর্ণ পরিচয়।

অথবা কোন ফুল, বাগান বা কোন বিশেষ প্রাকৃতিক দৃশ্য। এই ফুল বা বাগান বা বিশেষ কোন প্রাকৃতিক দৃশ্যের নিজস্ব একটা

সৌন্দর্য ও রূপ আছে; কিন্তু অন্যদিকে, প্রকৃতির বুকে লুকানো রয়েছে যে সীমাহীন রহস্য, সৌন্দর্য ও বর্ণসমারোহ, তার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এদের নির্বিশেষ রূপও একটা আছে। এই বিশেষ ফুলের ভেতর দিয়ে ব্যক্ত হয় নির্বিশেষ প্রাকৃতিক রহস্য ও সৌন্দর্য। পক্ষান্তরে, বিশেষ তখনই সত্য যখন তা ব্যক্ত করে নির্বিশেষকে, বিশেষ তখনই সার্থক যখন সে নির্বিশেষের সন্ধান দেয়।

অর্থাৎ, শিল্পসাহিত্য-কর্ম এই বিশেষ-নির্বিশেষের অখণ্ড রূপের অভিব্যক্তি; সুতরাং একে উপলব্ধিও করতে হ'বে অখণ্ডভাবে। শিল্পকর্মে যখন রূপায়িত হয় কোন প্রাকৃতিক চিত্র, তখন তাতে পূর্বোক্ত প্রাকৃতিক চিত্রের বিশেষ-নির্বিশেষ রূপ কতখানি ধরা পড়েছে, কতখানি পরিচয় আছে প্রকৃতির অখণ্ড সত্তার তার বিচার অপরিহার্য। অথবা, শিল্পকর্মে যখন রূপায়িত হয় বিশেষ কোন কালের মানবজীবন, তখন জীবন প্রবাহের বিশেষ রূপ এতে কতখানি সার্থকভাবে ব্যঞ্জনালাভ করেছে, শিল্পবিচারে তার পরিচয় অপরিহার্য। যে শিল্পী, যে কাহিনীকার, যে কবি বিশেষ কালের বিশেষ জীবনের মধ্যে নিত্যকালের জীবনপ্রবাহের নির্বিশেষ রূপকে জীবন্ত করে তুলতে পেরেছেন, শিল্পসাহিত্যের মানদণ্ডে তিনি তত বড় শিল্পী বলে আখ্যাত হবেন। গ্রীক শিল্প, গ্রীক ট্রাজেডি হাজার হাজার বছরের ব্যবধান পার হ'য়ে, শেক্সপীয়র, সারভেনটিস্, গ্যেটে, বালজাক, হাইনে প্রভৃতি শত শত বছরের ব্যবধান পার হয়ে কেন আজ পর্যন্ত মানুষের মনকে স্পর্শ করে, মহানুভবতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে, তার ইংগিত রয়েছে বিশেষ নির্বিশেষের সামগ্রিক ঐক্য-স্বরূপকে জানার মধ্যে। তাঁদের কালের বিশেষ জীবনের সঙ্গে নিত্য-

কালের নির্বিশেষ জীবনকে, মানবিক বোধ ও প্রেরণাকে তাঁরা অভিব্যক্ত করতে পেরেছিলেন বলেই মহৎ বলে স্বীকৃত।

আট

সাহিত্যে বাস্তবতার স্বরূপ বা অর্থ কি তা এবার উপলব্ধি করা যেতে পারে। পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে, প্রকৃতিকে জানা-রূপ কর্মের মাধ্যমেই মানুষের ইন্দ্রিয়াদির বিকাশ, জ্ঞান, চৈতন্য ও চৈতন্য-সঞ্জাত কর্মের বিকাশ ; শিল্পকর্মও তার অস্তিত্বেরই অপরিহার্য দিক।

শিল্পকর্মের মধ্যে মানুষ জানে বা উপলব্ধি করে নিজেকে। সুসমঞ্জস পরিপূর্ণ জীবনকে উপলব্ধি করার জন্য আদিকাল থেকে মানুষের যে অভিযান, সেই অভিযানেরই ভাবরূপ তার শিল্প, তার সাহিত্য। মানুষকে কখনও তার সমাজ প্রকৃতি পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা চলে না ; তার বহুমুখী প্রবণতাবিশিষ্ট সত্তাকে বহুদিক থেকে বহুভাবে সে খাপ খাইয়ে নেয় পরিবেশের সঙ্গে। মার্ক্সের কথায়,

Man adapts his all-sided being in an all-sided manner, in other words, as a total man.

সমগ্রভাবে সে উপলব্ধি করে নিজেকে। বহু বিচিত্র রং-রসে গড়া মানুষের মানসপরিমণ্ডল তেমনি বহু বিচিত্র মানবিক সম্পর্ক, ধ্যানধারণা, ঘাত-সংঘাতে গড়া মানুষের সমাজ। আর এই দুয়ের সমবায়ে সৃষ্টি হয় একটি অখণ্ড সত্তা। বস্তুনিষ্ঠ সাহিত্য রূপায়িত করে এই অখণ্ড সত্তাকে ; ঐ বিচিত্র মানুষটিকে বিচিত্র সমাজ পরিবেশের মধ্যে সংস্থাপিত করে, সমগ্রভাবে দেখে মানুষকে, দেখে সমগ্র সমাজ-

পরিবেশকে। খণ্ড খণ্ড ভাবে সমাজের কোন একটা দিককে অথবা মানবজীবনের কোন একটা দিককে, কোন একটা একক সমস্যাকে চিত্রিত করে না। মানুষের মন-মানস যেমন বহুমুখী, তেমনি তার রূপায়ণও সামগ্রিক। [উপন্যাস-নাটকের ক্ষেত্রেই যে এই রূপায়ণ পরিপূর্ণ সার্থক অভিব্যক্তি লাভ করতে পারে, তা বলাই বাহুল্য।]

দুএকটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বিচার করা যাক। টলস্টয়ের কোন একটি উপন্যাস যখন আমরা পাঠ করি, তখন বিস্ময়ের সঙ্গে এই কথাই আমরা ভাবি, কী গভীর ও ব্যাপক তাঁর দৃষ্টি, কী নিখুঁত তাঁর উপলব্ধি! মনে হয়, যেন কোন এক সুউচ্চ পর্বতচূড়ায় বসে তিনি নিরীক্ষণ করছেন সমগ্র মানব সমাজকে, সেই সমাজের অন্তর্গত কোন্ স্তরে কি ঘটছে, কোন্ শ্রেণী প্রচলিত সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে কীভাবে আন্দোলিত হচ্ছে, কোন্ ধ্যানধারণাভাবনার প্রতিজ্ঞায় উদ্বুদ্ধ হচ্ছে, তার সমগ্র রূপটাই তাঁর মানসপটে সত্য হয়ে ফুটে উঠেছে। সেই সত্যই উপন্যাসের পাতায় চিত্রিত হয়েছে। অর্থাৎ, সেই কালে সেই ক্ষণে বিভিন্ন মানুষের বাস্তব কর্ম-সম্পর্কের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল যে সামগ্রিক মানব-সত্তা, সেই সৃষ্টিশীল মানবিক সত্তা কীভাবে নিজেকে বিবর্তনের প্রবাহে ঢেলে দিয়েছে, তার পূর্ণ রূপটাই শিল্পীর কলমের মুখে ফুটে উঠেছে। তিনি জেনেছেন সমগ্র জীবনকে, সমগ্র সমাজকে, এদের সমন্বিত অখণ্ড সত্তাকে; জেনেছেন মানবিক আকৃতিকে, আর তাকেই ব্যক্ত করেছেন অবিস্মরণীয় কুশলতায়।

তেমনি, বালজাক সম্পর্কে এঙ্গেলস্ বলছেন, বালজাক ফরাসী সমাজের অত্যন্ত বিস্ময়কর বাস্তব চিত্র এঁকেছেন; এই চিত্র থেকে তিনি এমন কিছু শিক্ষালাভ করেছেন যা পেশাদার ইতিহাসবিদ, অর্থ-

নীতিবিদ বা সংখ্যাতত্ত্ববিদদের কাছ থেকেও তিনি জানতে পারতেন না। তাহ'লে এই সামগ্রিক চেতনা এই মুহূর্তে প্রবাহিত-হ'তে-থাকা সামগ্রিক জীবনকে অখণ্ডভাবে বোঝা, উপলব্ধি করা, সেই উপলব্ধিকে সত্যরূপে প্রকাশ করাই বস্তুনিষ্ঠ সাহিত্যের মূলকথা। বালজাকের যদি এই চেতনার অভাব হ'তো তাহ'লে তাঁর পক্ষে তাঁর প্রিয় অভিজাত সম্প্রদায়ের পতন ও শ্রমজীবী জনতার আবির্ভাব চিত্রিত করা কোন-ক্রমেই সম্ভব হ'তো না।

বর্তমান সমাজকে যাঁরা রূপায়িত করবেন, বর্তমান জীবন প্রবাহের সামগ্রিক রূপটা তাঁদের উপলব্ধি করতে হ'বে সর্বাগ্রে। এতে যেমন আছে সুন্দর-অসুন্দর, ভাল-মন্দর সংমিশ্রণ, তেমনি আছে ধনিক-শ্রমিক শ্রেণীর সংঘাত। একদিকে ধ্বংস-হ'তে-থাকা ধনিক সভ্যতা, অপরদিকে সৃষ্টি-হতে-থাকা শ্রমিক (সর্ব মানবিক) সভ্যতা; এর সঙ্গে সংযুক্ত করা যেতে পাবে মানুষের মনের বিচিত্র ভাবনা-কল্পনা। সেই শিল্পীই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে প্রখ্যাত ও সমাদৃত হ'বেন, যিনি এই সমগ্র চিত্রটিকে মানবীয় সংবেদনশীলতায় সমৃদ্ধ করে মানুষের অনুভূতিতে সত্য করে তুলে ধরতে পারবেন। কিন্তু বর্তমান কালের সামগ্রিক জীবন প্রবাহেব কথা বিস্মৃত হ'য়ে যদি কোন শিল্পী জীবনের অন্যান্য দিক বাদ দিয়ে শুধুমাত্র একটি দিককে তুলে ধরেন (দৃষ্টান্তস্বরূপ, ক্ষয়-পেতে-থাকা ধনিকসভ্যতাকে বাদ দিয়ে শুধু সৃষ্টি-হতে-থাকা সমাজতন্ত্রকে তুলে ধরা, অথবা অন্যান্য দিক ভুলে শুধু শ্রেণী সংগ্রামকে জীবনের একমাত্র সত্য বলে চিত্রিত করা), তা'হলে সমাজপ্রবাহ সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও চেতনা (অতএব তাঁর শিল্পকর্মও) যে খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ হবে তা নিঃসন্দেহ। অথচ, আশ্চর্য এই, মার্ক্স-এঙ্গেলসের

নাম ক'রে অভিজ্ঞতাকে, জীবন সম্পর্কে জ্ঞান ও বোধকে, শিল্পকর্মকে খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ করার উপদেশ দেওয়া হচ্ছে ও জীবনের বহু বিচিত্র সত্তাকে শুধুমাত্র শ্রেণী-সংগ্রাম অর্থাৎ রাজনৈতিক কর্মের মধ্যে সঙ্কুচিত করার চেষ্টা হ'চ্ছে। জটিল সমাজপ্রবাহকে যখন কয়েকটি মাত্র আঙ্কিক সূত্রের মধ্যে ধরার চেষ্টা হয়, তখন লাভ হয় এই সূত্রটাই, জীবনকে তাতে পাওয়া যায় না। কারণ, যে মানুষ জ্ঞানে অজ্ঞানে শ্রেণী-সংগ্রামের অংশীদার, সে মানুষ আবার বহুবিধ হৃদয়বৃত্তিতে উদ্বেলিতও হয়—সে হাসে, কাঁদে, ভালবাসে, খেলেও; সব কিছু মিলে সমগ্রভাবে সে এক, অখণ্ড। এই অখণ্ড মানুষের রূপায়ণই মার্ক্স-এঙ্গেলসের কাম্য। বস্তুনিষ্ঠ সাহিত্যের নিকট এই তাঁদের দাবী। অবশ্য মার্ক্স-এঙ্গেলসের আমলেও পূর্বোক্ত ধরণের বিকৃতি দেখা দিয়েছিল। এঙ্গেলস তাই ফ্রিলিগ্রাথ সম্পর্কে বিদ্রূপ করে বলেছিলেন,

Read Freiligrath's "Epistles" for example, you would really think people had no sexual organs.

মার্ক্স-এঙ্গেলসের দৃষ্টি পূর্বাপর ডায়লেকটিক্ ছিল—তাই শিল্প-সাহিত্যের বিচারেও তাঁরা তাঁদের মূলদর্শন থেকে কোনকালে বিচ্যুত হননি।

জীবন ও সমাজের এই সামগ্রিক রূপায়ণে বিশেষের মধ্যে নির্বিশেষকে পাওয়া চাই। বর্তমানের কালবিধৃত জীবনের মধ্যে নিত্যকালের জীবন প্রবাহের অভিব্যক্তি চাই; তেমনি একটি বিশেষ চরিত্রের মধ্যে-মার্ক্স-এঙ্গেলস্ পেতে চান তার জাতিরূপকে (Type); একটি শ্রমিক চরিত্রের মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীর, একটি ধনিক চরিত্রের মধ্যে সমগ্র ধনিকশ্রেণীর সর্ববিধ বৈশিষ্ট্য, পূর্ণ পরিচয় পেতে চান। এঙ্গেলস্ তাই বাস্তবতার সংজ্ঞায় বলেন:

Realism, to my mind, implies, besides truth of detail, the truthful reproduction of typical characters under typical circumstances.

কিন্তু শিল্পসাহিত্য কতখানি প্রচারধর্মী? ইতিপূর্বে শিল্পকর্মের স্বরূপ, তার মূলগত প্রেরণা ইত্যাদির আলোচনায় আমরা দেখেছি, শিল্পী তাঁর ভাবনা-কল্পনা-মননের ভিতর দিয়ে কোন এক স্তরে তাঁর বিষয়বস্তুর সঙ্গে এক হয়ে মিশে যান। বিষয়বস্তুর সঙ্গে এক-হয়ে-যাওয়া সত্তাই শিল্পকর্মের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। বাস্তব সামাজিক সত্যকে যখন তিনি উপলব্ধি করেন, তখন তাঁর সত্তাও ঐ বাস্তব সত্যের সঙ্গে এক হয়ে বিলীন হয়ে যায়। শিল্পীর মানস সংগঠনের এবম্বিধ বৈচিত্র্যের জন্যই সার্থক শিল্পকর্ম প্রত্যক্ষভাবে প্রচারধর্মী হতে পারে না; তিনি জেনেছেন সমগ্রকে, রূপায়িতও করেন এই সমগ্রকে, সমগ্রের অন্তর্গত বিশেষ কোন মনোভঙ্গী অথবা আদর্শকে নয়। মার্ক্স তাই বলেছিলেন, মানুষ সত্যসত্যই সৃষ্টি করে তখনই, যখন সে প্রত্যক্ষ জৈবিক গরজ থেকে মুক্ত। এঙ্গেলস্ও একই মনোভাবের পুনরুক্তি করে বলেছেন, শিল্পীর নিজস্ব মনোভঙ্গী বা মতামত যত লুকানো থাকে, শিল্পকর্মের পক্ষে ততই মঙ্গল: The more the author's views are concealed the better for the work of art.

এঙ্গেলস্ বলেন, এসকাইলাস, এরিষ্টোফানিস প্রভৃতির লেখায় দস্তুরমত বিশেষ একটা মনোভঙ্গী ফুটে ওঠে। কিন্তু এটা ফুটে উঠেছে শিল্পীর অজানিতে—তাঁরা তাঁদের মতামত বা আদর্শকে প্রচার করার জন্যই শিল্পকর্মে আত্মনিয়োগ করেননি, তাঁদের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত প্রেরণা আছে, সেই প্রেরণার তাগিদেই তাঁরা সামগ্রিক জীবন প্রবাহকে

রূপায়িত কোরেছেন; এই রূপায়ণের পথে অন্যান্য জিনিষের সঙ্গে শিল্পীর মনোভাবও ব্যক্ত হয়ে গিয়েছে নেহাৎই অপ্রত্যাশিতভাবে। মতামত প্রচারের জন্য লেখা নয়—না লেখে উপায় নেই বলেই লেখা; এই লেখার মধ্যে মতামতের প্রকাশ নিতান্তই অনিমন্ত্রিত আগন্তুকের আগমনেব মত। এই প্রসঙ্গটির আলোচনা করে এঙ্গেলস্ বলেছেন, লেখকের যদি বিশেষ কোন মতামত বা বক্তব্য বা মনোভঙ্গী থাকে তা যেন ঘটনা সন্নিবেশ থেকে আপনা আপনি প্রবাহিত হয়; পাঠকের চোখে আঙ্গুল দিয়ে যেন কখনো তিনি সমাজিক বিরোধের ঐতিহাসিক সমাধান না বুঝাতে যান; সমগ্রভাবে বাস্তব সামাজিক জীবন রূপায়িত হলেই হলো, নাই বা থাকলো লেখকের কোন নির্দিষ্ট সমাধান। এঙ্গেলসের এই উক্তিটি এতো সুন্দর যে উদ্ধৃতির লোভ সামলানো দুষ্কর:

I think that the bias should flow by itself from the situation and action, without particular indications, and that the writer is not obliged to obtrude on the reader the future historical solutions of the social conflicts pictured. ....therefore a socialist-biased novel fully achieves its purpose, in my view, if by conscientiously describing the real mutual relations, breaking down conventional illusions about them, it shatters the optimism of the bourgeois world, instills doubt as to the eternal character of the existing order, although the author does not offer any definite solution or does not even line up openly on any particular side.

শিল্পী যা রূপায়িত করবেন তা বিষয়গতভাবে সত্য হলেই হ'লো। কোন বিশেষ দলে না ভিড়লেও তাঁর শিল্পের বস্তুনিষ্ঠার মর্যাদা হানি হবে না।

মার্ক্স-এঙ্গেলস্ এই দৃষ্টিকোণ থেকেই বালজাক ও অন্যান্য শিল্পীর শিল্পকর্মের বিচার করেছেন। সেজন্যই বালজাক বুর্জোয়া ভাবাদর্শের সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সাহিত্যকে 'বাস্তবতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজয়,' বলে অভিহিত করতে তাঁদের বাধেনি। কারণ তাতে হাঁ না'র মিলিত অখণ্ড সামাজিক সত্য রূপায়িত হয়েছিল,—বুর্জোয়া আদর্শের ক্ষয়-পেতে-থাকা রূপ এবং নবযুগের নবীন মানুষের সৃষ্টি-হতে-থাকা রূপ ধরা পড়েছিল। অর্থাৎ বালজাক-সাহিত্য বিশেষ কালের অভিব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও তার মধ্যে নিত্যকালের নির্বিশেষ রূপ আত্মপ্রকাশ করেছিল—ইহা সমাজ প্রবাহেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কোনও না কোনভাবে তা প্রবাহকে সমৃদ্ধ করেইছে।

মানুষের শিল্পকর্মকে এই প্রবাহের অন্তর্গত করে নিরবচ্ছিন্ন ধারার গতির সঙ্গে সংযুক্ত করে দেখলেই বিকৃত অর্থনৈতিক দৃষ্টির একপেশেমী থেকে মুক্ত হওয়া যায়, সাহিত্যের যথাযথ মানবিক মূল্য নির্ধারণ সম্ভব হয়। সমস্ত যান্ত্রিক সরলীকরণের বিরোধী মার্ক্স-এঙ্গেলসের শিল্পদৃষ্টির ইহাই মূল কথা।

আশ্বিন, ১৩৫৮

মার্ক্সবাদ ও শেক্সপীয়র সাহিত্য

এক

'বিলিভ ইট অব নট' নামক আজব বই-এর লেখক বলেছেন, শেক্সপীয়র বানান নাকি ছ'হাজার উপায়ে লেখা যায়। আমার মনে হয়, শেক্সপীয়র সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেছেন এমন লোকের সংখ্যাও ছ' হাজারের কম হবে না। তবু সংস্কৃতিবান পাঠকের মনে এ অভিযোগ থেকেই গিয়েছে যে, কোন আলোচাই সম্পূর্ণাঙ্গ হয়নি।

ফরাসী বিপ্লবোত্তর ইংরেজ সমালোচকদের আবির্ভাবের আগে শেক্সপীয়র সাহিত্যের পরিচয় বড় একটা কেউ জানত না। ইংল্যাণ্ডের ভৌগোলিক সীমানার বাইরে তো নয়ই। অথচ সে সময়ে শেক্সপীয়র সাহিত্যের বয়স দুশো বছর পার হয়ে গেছে। এই ব্যবধান-কালীন বিদগ্ধ ইংরেজ সমাজ শেক্সপীয়র সাহিত্যের কালজয়ী স্বাদ তেমন কিছু আছে বলে মনে করতেন না; আর নেহাম টেট তো শেক্সপীয়র ট্র্যাজেডির উপর কলম চালিয়ে তাকে রসোত্তীর্ণ করবার সৎসাহসও দেখিয়েছিলেন। নেহাম টেটরা বিভ্রান্ত হয়েছিলেন বা তাঁদের রসবোধ প্রখর ছিল না বলে সহজেই ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু রোমান্টিক সমালোচকদের সময় থেকে যে বিরাট শেক্সপীয়র সমালোচনা স্তূপীকৃত হয়ে উঠেছে তাতেও সমসাময়িক সমাজগঠন এবং

সাংস্কৃতিক পটভূমিতে রেখে শেক্সপীয়র সাহিত্যের আসল সত্তার পরিচয় আমরা পেয়েছি কি, বা কতটুকু পেয়েছি ?

আদর্শবাদী ভাবধারায় পুষ্ট সমালোচদের সূত্র হলো আত্মমুখী। স্রষ্টা বা পাঠকের ভাবানুভূতিই হ'লো প্রধান কথা; আর সেক্ষেত্রে সমালোকের হৃদয়ে আর্ট যে ভাবতরঙ্গ সৃষ্টি করে, তা ব্যক্ত করেই সমালোচক খালাস, হয়ত বা একই উৎস থেকে বিভিন্ন সমালোচক বিভিন্ন স্বাদ গ্রহণ করেন। সেই জন্যেই শেক্সপীয়র সাহিত্যে কোলরিজ এমন কিছুর খোঁজ পেয়েছিলেন, যা বাস্তবিক সেখানে পাওয়ার কথা নয়। তাছাড়া, সৃষ্টিধর্মী মন ছাড়া আর কোন বিষয়মুখী সত্যের স্বীকৃতি এখানে নেই। ধরুন, দেয়ালে ফ্রেমে বাঁধানো ফটো রয়েছে; এই ফ্রেম ফটোকে সারা পৃথিবীর সংযোগ থেকে বিছিন্ন করে রেখেছে। আপনি যখন এর বিচার করবেন, তখন স্থান-কালের পরিধি টানলে চলবে না, ভুলে যেতে হ'বে যে এটা একটা দেয়ালে টাঙ্গানো রয়েছে। তেমনি, শেক্সপীয়রের বাঁধানো রচনাবলী রয়েছে আপনার টেবিলে। আর আছে প্রতিটি তরঙ্গায়িত ছত্রের পেছনে শেক্সপীয়রের সৃষ্টিধর্মী মন; নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন স্থান ও কাল-বিধৃত; তাঁর সাহিত্যের বিচারে ও মূল্য নির্ধারণে সেটা থাকবে উহ্য; সে সবের স্থান সমাজতত্ত্বে, সাহিত্য বিচারে নয়। আর উপস্থিত গরজের তাগিদ থাকে যে রচনার পশ্চাতে, তা নন্দন শাস্ত্রের পরিমাপে উতরোবে কবে ?

এ যুক্তিজাল থেকে যে সমালোচনা জন্ম নেয়, তার গভীরতা শুধু সাহিত্যের শারীরবৃত্ত নিয়ে আলোচনায়। কিন্তু গভীরতার পরেও যে গভীরতা আছে, শারীরবৃত্তের পরেও যে আছে সমাজ ও ব্যক্তি-সম্পর্কের তন্তুজাল সংস্পৃষ্ট মনস্তত্ত্ব, এ মতবাদের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের

কাছে সেটা অপ্রাসঙ্গিক। শেক্সপীয়র-সাহিত্যে যে ভাবের লীলা, বা ভাবধারার সংঘাত, তাতে তাঁরা একটা নির্গুণ নৈর্ব্যক্তিকতার পরিচয় পান, যা স্থানকালের উর্ধ্বে।

সমসাময়িক সমাজ ও মানস-সংস্কৃতির সঙ্গে যা সম্পর্কিত, তাকে এভাবে সম্পর্কবিমুক্ত করে বোঝাতে চেষ্টা করলেও তার আসল পরিচয়ের অনেকখানিই যে লুকানো থাকে, তা আর ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। শেক্সপীয়র-সমালোচনা-সাহিত্যে যে সব রচনাকে আমরা কুলীন বলতে পারি তাদের মৌলিক অসম্পূর্ণতা হ'লো এখানে।

দুই

এ যুগের নূতন সমালোচনা, যে সমালোচনার যুক্তিবিজ্ঞান মার্ক্সবাদ, এ অসম্পূর্ণতা বিদূরণের দাবী নিয়ে এগিয়ে এসেছে। মার্ক্সবাদের বস্তুধর্মী ঐতিহাসিক সমাজ ও মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ-পদ্ধতির প্রয়োগে সাহিত্য-বিচারের অনতিক্রান্ত সীমান্তে, গভীরতার গভীরতায় পৌছানোর ইঙ্গিত পাওয়া যাবে, এই প্রত্যাশাই মার্ক্সবাদী সাহিত্য সমালোচনাকে মর্যাদা দিয়েছে। এই মার্ক্সবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে শেক্সপীয়র সাহিত্যেরও সত্তা ও তাৎপর্য উপলব্ধি করার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু বিগত যুগের রোমাণ্টিক বা রোমাণ্টিক-হিউমানিষ্ট শেক্সপীয়র সমালোচনার তুলনায় শেক্সপীয়র-সত্তা-বিচারের ক্ষেত্রে মার্ক্সবাদী সমালোচনা যে অধিকতর সার্থক বা সফলকাম হয়েছে সে কথা নিশ্চিত-প্রত্যয় হয়ে বলা চলে না। কিছুকাল পূর্বে প্রকাশিত, সোভিয়েট অধ্যাপক স্মিরনভের "শেক্সপীয়র", মার্ক্সবাদী শেক্সপীয়র-সমালোচনা এবং সাহিত্য-সমালোচনার একটা বহুল প্রচারিত, প্রচলিত দৃষ্টান্ত। প্রচলিত

দৃষ্টান্ত বল্‌ছি এইজন্য যে স্মিরনভ জাতীয় লেখকদেব মারফতেই আমরা "মার্ক্সবাদী" সমালোচনা সাহিত্যব পরিচয় পাই ; হয়তো বা তাঁদের মার্ক্সবাদেরও কিছু পরিচয় পাই। সুতরাং স্মিরনভকে অবলম্বন করে আমাদের আলোচনার সূত্রপাত করলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তবে স্মিরনভের মার্ক্স-'বাদ' 'মার্ক্স'-বাদ কিনা, সাহিত্য-সমালোচনায় সার্থকতর, সম্পূর্ণতব উপলব্ধির কাছাকাছি আমাদের নিয়ে আস্‌তে পেরেছে কিনা, সে কথা স্বতন্ত্র। অন্তত স্মিরনভেব মার্ক্সবাদ যে তা' পাবেনি সে কথাই আমার বক্তব্য।

স্মিবনভ প্রমুখ 'মার্ক্সবাদী' সাহিত্য সমালোচকদের নিয়ে বিপদ এই যে সাহিত্যিক-মানসকে সমসাময়িক যুগের অর্থনীতি এবং বিশেষ শ্রেণীর অর্থনীতি এবং বিশেষ শ্রেণীর অর্থনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে দেখিয়ে তাঁরা নিজেদেব দায়িত্ব শেষ হোলো বলে মনে করেন। মনস্তত্ত্বের মধ্যে তাঁরা প্রবেশ কবেন বটে, কিন্তু মনস্তত্ত্বে বিশেষ শ্রেণীজাত সাহিত্যিকের শ্রেণীস্বার্থ-প্রসূত economic hedonism বা আর্থিক স্বার্থবাদের বেশী তাঁরা অগ্রসর হন না. হতে পারেন না। সাহিত্য সমালোচনায় মার্ক্সবাদেব অর্থ স্মিরনভদের হাঁতে দাঁড়িয়েছে এই যে, সাহিত্যকলার যে কোন নিদর্শনকে বুঝতে হলে বা তার মূল্য বিচার করতে হলে, তা, কোন্ যুগের সাহিত্য, সেই যুগের সমাজের বিশেষ কোন্ শ্রেণীব সাহিত্য, সাহিত্যিক নিজে কোন্ শ্রেণীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, সেই শ্রেণীর তদানীন্তন আর্থিক এবং রাষ্ট্রিক স্বার্থ কি ছিল, সেগুলি প্রথমে বুঝতে হবে। কারণ সাহিত্যিক-মানস আসলে পরিচালিত হয় সমসাময়িক আর্থিক শ্রেণীচেতনা দিয়ে—এই হলো স্মিরনভদের মনস্তত্ত্ব। সুতরাং সাহিত্যিকের শ্রেণীস্বার্থ বুঝতে পারলে

তাঁর মনের গতি, তাঁর কল্পনা, তাঁর ভাবনা-কামনা প্রকাশের বিশিষ্ট ভঙ্গী, তাঁর সাহিত্যের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ, উভয়বিধ পরিচয়, সব কিছুই বোঝা যাবে। সাহিত্য-বিচার সম্পর্কে এই রকম 'বস্তুবাদী;' ধারণা থাকাব ফলে শেক্সপীয়র যুগের সাহিত্যকলার ইতিহাস বা সমসাময়িক সমাজ-সংস্কৃতির মূলদেশে স্মিরনভ যেটুকু বা আলোকপাত করতে পেবেছেন, তাতে আমাদেব শেক্সপীয়র উপলব্ধি যে রোমাণ্টিক সমালোচনার অসম্পূর্ণতা ও একদেশদর্শিতাকে অতিক্রম করে কোনো পবিপূর্ণতর বা গভীরতর স্তরে অগ্রসর হতে পারেনি—হতে পারা অসম্ভব ছিল, তা বলাই বাহুল্য।

যাঁরা ইতিহাস এবং সমাজতত্ত্বের মার্ক্সীয় যুক্তি-বিজ্ঞান অবলম্বন করে, সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্পকলা কিম্বা এসথেটিক্সের বিশেষ কোনো দিক দিয়ে আলোচনা করতে চান, তাঁদের অনেকেব মধ্যেই গোটা আলোচনাটাকে মার্ক্সীয় সমাজ-বিজ্ঞানের ও অর্থনীতির আদি-সূত্রে রূপান্তরিত করার অর্থাৎ একটা যান্ত্রিক সরলীকরণের লোভনীয় প্রবণতা দেখা যায়। মার্ক্সবাদী সমালোচকের পক্ষে এ প্রবণতাকে সাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রে, মারাত্মক ছাড়া আর কিছু বলা যেতে পারে না। এই প্রবণতার অর্থ, মার্ক্সীয় অর্থনীতি এবং সমাজতত্ত্বের মূলসূত্রগুলো মুখস্থ করাতে সমালোচক যতটা পারদর্শিতা দেখিয়েছেন মার্ক্সীয় যুক্তি-বিজ্ঞানকে অবলম্বন করে সে সূত্রগুলোকে সাহিত্যর ক্ষেত্রে কি ভাবে প্রয়োগ করতে হবে সে তত্ত্ব আদৌ আয়ত্ত করতে পারেন নি। ফলে সাহিত্য-বিচারে, মানস-সংস্কৃতির বিশ্লেষণে, সাহিত্য-কলার মূল্যমান নির্ধারণে, মার্ক্সীয় অর্থনীতির মূলসূত্রের যান্ত্রিক ব্যবহারটাই বার বার চোখে পড়ে। অথচ এই ধরণের যান্ত্রিকতার সঙ্গে মার্ক্সীয় যুক্তিবিজ্ঞানের

যে মূলগত বিরোধ রয়েছে সে কথা তো মার্ক্সীয় পণ্ডিতদের মুখে মুখে!

অধ্যাপক স্মিরনভের মতে শেক্সপীয়র ছিলেন "...the humanist ideologist of the bourgeoisie, the exponent of the programme advanced by them when, in the name of humanity, they first challenged the feudal order, but which they later disavowed" (পৃঃ ১৩০) : কি ভাবে?

স্মিরনভ বলছেন, ইংল্যাণ্ডে জরিষ্ণু সামন্ততন্ত্র, আর বর্ধিষ্ণু বুর্জোয়া শ্রেণী, এ দুটো বিরোধী শ্রেণীর মধ্যে সাময়িক বোঝাপড়ার ফলে এ দু'য়ের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য যে মিশ্রিত রাষ্ট্রব্যবস্থা চালু হয়েছিল তা হ'লো একছত্র রাজতন্ত্র বা absolutism; শেক্সপীয়র সাধ্যমত এই absolutism সমর্থন করে গিয়েছেন।..... হ্যামলেটের প্রশ্নজর্জর নিরাশা-ভরা নিষ্ক্রিয়তা আর দুঃখবাদের মূল আধার কোথায়? উত্তর হ'লো: ১৬০০ সালের দিকে absolutismএর ক্ষয়িষ্ণুতার আরম্ভে। কারণ, এ ব্যবস্থা পত্তনের অর্থ, এর ছত্র-ছায়ায় বুর্জোয়ারা নিজেদের শ্রেণীগত আত্মপ্রসাবের জন্য যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল, তারও বিলোপ। সুতরাং বুর্জোয়া শ্রেণীর কবি শেক্সপীয়ব তাঁব শ্রেণীর প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিলেন বলেই এ সঙ্কটে পৃথিবী সম্পর্কে এতো নিরুৎসাহী হয়ে পড়েছিলেন (পৃঃ ৮৮)।

.........কিং জন নাটকে শেক্সপীয়র Magna Carta-র কোন উল্লেখ করেন নি; কারণ, তার ভেতর দিয়ে জনগণের দাবীর নিকট ইংলণ্ডেশ্বরকে অংশত হার মানতে হয়েছিল। কিন্তু শেক্সপীয়র তাঁর শ্রেণীস্বার্থ-প্রসূত এ্যাব্‌সল্যুটিষ্ট সহানুভূতি দ্বারা চালিত হয়ে কিং জনের

মধ্যে দুর্দান্ত প্রতাপশালী রাজচরিত্র চিত্রিত করতেই চেয়েছেন, Magna Carta-র উল্লেখ করে রাজচরিত্রের দুর্বলতা প্রকাশ করতে চান নি (পৃঃ ৬০)।

আর উদ্ধৃতির প্রয়োজন পড়ে না। স্মিবনভের এই উক্তির তাৎপর্য কি, আর এ ধরনের উক্তি ও বিচারে শেক্সপীয়র সাহিত্য এবং শেক্সপীয়র প্রতিভার সত্যকার পরিচয় পাওয়া যায় কিনা, তা নিশ্চয়ই ভেবে দেখাব মত।

তিন

সাহিত্যকে আমরা বলি, অনুভূতির বিজ্ঞান, যেমন বিজ্ঞানকে বলি জানার আর্ট। এর সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা হলো, বিজ্ঞানে প্রকৃতিকে জেনে সামাজিক মানুষ যেমন প্রকৃতিকে জয় করে, সাহিত্যে সে নিজেকে জেনে আত্মজয় উপলব্ধি করে। আর সমাজ ও সমাজ-মানস-সমন্বিত বস্তুজগত আমাদের চেতনা ও ভাবের অনতিক্রমনীয় এবং অবিচ্ছেদ্য মূল আধার বলে, আমরা সাহিত্যকে বলতে পারি সেই বাস্তব জগতের প্রতিফলন; যে জগতে আমরা কাজ করি, যে জগতকে আমরা রূপান্তরিত করি, যে জগতে আমরা পরস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ হই, আবার যে সম্পর্ককে আমরা ভাঙ্গি, নূতন করে গড়ি। অর্থাৎ, আমাদের বহুধা কর্মের বিচিত্র রূপ, বিচিত্র ভাবনা-কামনা সাহিত্যে প্রাণ পায়। আর এ থেকে এটাও স্বভাবতঃই এসে পড়ে, বিশেষ বাস্তব পরিস্থিতিতে, বিশেষ ঐতিহাসিক স্তরে, বিশেষ ভাবধারায়, বিশেষ সাহিত্যের জন্ম হয়। মার্ক্স যে বলেছিলেন সামাজিক জীবনযাত্রা আমাদের সমষ্টিগত সমাজ মনের মোটামুটি

প্রকাশ ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে, সাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রে এই সূত্রের তাৎপর্য এর বেশী আর কিছু নয়। এ ছাড়া মার্ক্সের দ্বিতীয় মূল প্রতিপাদ্য ছিল—সামাজিক জীবনযাত্রা যখন সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক শ্রেণী-বিন্যাসের ওপর নির্ভরশীল তখন সমাজমনের প্রকাশধারার ভেতর দিয়ে সামাজিক জীবনযাত্রার অর্থনীতি, তার মূলগত শ্রেণী-দ্বন্দ্ব বা সাময়িক শ্রেণী-সমন্বয় এগুলিও, পরোক্ষে হলেও, প্রতিফলিত হয়; শুধু তাই নয়, সমাজমনের সামগ্রিক প্রকাশধারা মূলগত শ্রেণী বিন্যাস ও শ্রেণী সংগ্রাম দ্বারাই শেষ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত হয়। মার্ক্সবাদী সাহিত্য সমালোচনায় যান্ত্রিকতার প্রভাব অবশ্য অনুপ্রবিষ্ট হয় মার্ক্সীয় সমাজতত্ত্বের এই মূলতত্ত্বকে উপলক্ষ্য করেই।

স্মিবনভেব উপরোক্ত দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যাবে, কি ভাবে মার্ক্সবাদীমন্য সহিত্য-সমালোচক সাহিত্যস্রষ্টার অর্থনৈতিক শ্রেণী আনুগত্য এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শ্রেণীস্বার্থের কথা নির্দেশ করেই তাঁর কর্তব্য শেষ হলো বলে মনে করেন। যে কোনো যুগের সামাজিক মানস-সংস্কৃতি সাধারণ ভাবে (মার্ক্সের কথায় 'in general') তার ব্যবহারিক জীবন যাত্রার প্রণালী দ্বারা নিরূপিত হয়। কিন্তু সেটা সাধারণভাবেই, অন্য কোন লৌহকঠিন যান্ত্রিক বন্ধনে নয়। তাই, সাধারণ ভাবে, শিল্প সাহিত্যও সে যুগের জীবন প্রণালির পরিচয় দেয়। কিন্তু এ ব্যাপারে কোন বাধ্য বাধকতা নেই অর্থাৎ সে যুগের উৎপাদন, শ্রেণী বিভাগ, এসবের সঙ্গে খাপ খেয়ে গড়ে ওঠলেও মানস-সংস্কৃতির বহুমুখী প্রকাশধারার যে অংশ সাহিত্যকলাকে আশ্রয় করে রূপায়িত হয়, তাও যে প্রত্যক্ষ ও সচেতনভাবে সমসাময়িক যুগের ব্যবহারিক অর্থনীতি বা সমসাময়িক বিশেষ সামাজিক শ্রেণীর

রাজনীতিকে প্রতিফলিত করবেই তা নয়। মার্ক্স তাই সমাজ-সংক্রান্তির যুগের মানস-সংস্কৃতিকে সামাজিক জীবনযাত্রার মূলভিত্তিগত অর্থনৈতিক পরিবর্তন-ধারা থেকে স্বতন্ত্র ভাবে বিচার করতে বলে গিয়েছেন। মানস-সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকের ভেতর দিয়েই মানুষের মনে সমাজ-জীবনের মূলভিত্তিগত বিরোধ রূপায়িত হয়। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সে যুগের সমাজজীবনের মূলভিত্তির দিকে দৃষ্টিপাত করলেই মানস-সংস্কৃতির ভেতর দিয়ে কেমন করে, কি ভাবে, মানুষের চেতনা রূপ পায়, তা' বোঝা সহজ হয়ে যাবে। অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে মানস-সংস্কৃতির প্রবহমান ধারার পরিবর্তনকে সংশ্লিষ্ট করে দেখতে পারলে মানস-সংস্কৃতির সাধারণ গতি (general movement) কোন দিকে তার ইঙ্গিত পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই। কিন্তু সে ইঙ্গিত পেলেও সমাজ-মনের ওপর সমাজ-জীবনের বস্তুগত প্রতিফলনের নিয়ম বোঝা যাবে না, কিম্বা সাহিত্যিকের মনের মাধ্যমের ভেতর দিয়ে সমাজ-মন কি ভাবে রূপায়িত হয়ে আসে তাও বোঝা যাবে না। সাহিত্যের ভেতর দিয়ে—বিশেষত ব্যক্তি সাহিত্যিকের মনের স্বকীয় বিশিষ্ট প্রকাশ ভঙ্গীর ভেতর দিয়ে—সমাজমন এত আঁকাবাকা ভাবে, এত জটিল তন্তুজাল সূত্রে, এত পরোক্ষ ভাবে প্রকাশিত হয় যে সমাজ-মনের এই বিশিষ্ট পরোক্ষ প্রকাশভঙ্গীর সাহায্যে সমাজ-জীবনের অর্থ-নৈতিক ভিত্তি বা তার শ্রেণীবিন্যাসকে বোঝা যায় না। সমাজমনকে ব্যবহারিক ও অর্থনৈতিক সমাজজীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে বুঝতে হবে একথা মার্ক্স নিশ্চয়ই বলেছিলেন। কিন্তু সাহিত্য ও শিল্পকলার সূক্ষ্ম অনুভূতির ক্ষেত্রে সমাজমনের বিশিষ্ট ধরণের প্রকাশভঙ্গী দিয়ে সমাজ-জীবনের আর্থিক ভিত্তিকে বোঝা যাবে, কিম্বা সাহিত্যকলা কি ভাবে

সমাজমনকে এবং সমাজমন কি ভাবে রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক সমাজজীবনকে প্রতিফলিত করে তা বোঝা যাবে, একথা মার্ক্স বা এঙ্গেল্স বা লেনিন কেউ কোনোদিন বলেন নি। তেমনি সমসাময়িক সমাজজীবনেব ব্যবহারিক গতিধারা আর সমাজমনের সামগ্রিক গতিধাবাকে পবস্পরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে দেখতে পাবলেই সাহিত্যের কিম্বা সাহিত্যিকেব প্রচ্ছন্ন মনস্তত্ত্ব বা মনোবিজ্ঞানকে বোঝা যাবে, সাহিত্য সৃষ্টিব মূল্য বিচাব কবা যাবে, একথাও তাঁরা কেউ বলেন নি।

চার

মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠার বিকাশধারার রূপ বলেই আমরা বিশেষ একটা ঐতিহাসিক স্তবকে তার অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ দিয়ে বিচার করি। তেমনি একটা বিশেষ যুগের ভাবধাবা বা তাব সাহিত্যকেও মার্ক্সবাদ মানুষেব সাংস্কৃতিক বিজয়-অভিযানের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে সামনে বেখে বোঝা এবং বিচার করাব নির্দেশ দেয়। মার্ক্সবাদের এটা একটা অতি সাধারণ সূত্র এবং, মার্ক্সবাদ ছাডাও, অন্যদের মধ্যেও, এ সূত্রের প্রায় সর্ববাদী সম্মতি আছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে, কথাটাকে আর একটু পরিষ্কার করে বললে বলা চলে—একটা বিশেষ যুগে আছে একটা বিশেষ সামাজিক পরিস্থিতি, সংস্কৃতি, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সংগঠন, সমাজের শ্রেণীবিন্যাস এবং তার আভ্যন্তরীণ সামাজিক শ্রেণী-সংঘর্ষ। সে যুগের সমসাময়িক চিন্তাধারা, তার সমগ্রিক সমাজ-মানস এবং মনন-পদ্ধতি, সাধারণভাবে এই আর্থিক রাষ্ট্রিক ও সামাজিক শ্রেণী সংগঠন, চল্তি বাস্তব সামাজিক পরিস্থিতি, এসবকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে, যাকে আমরা বলি সে যুগের ভাবধারা

অথবা ideology। একে সাহিত্য কি ভাবে প্রতিফলিত করেছে, কি ভাবে বিশ্লেষণ করেছে, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ এই সম্পর্কে সূত্রটাকে কতদূর ধরতে পেরেছে বা কি ভাবে ধরেছে, এবং ধরতে গিয়ে সর্বকালের ও সর্বদেশের মানবীয় মানসকে বা মানবিক সত্যকে কি পরিমাণে অঙ্গীকার করেছে, কি পরিমাণে সমসাময়িক মানুষের মনে সেই সত্যের প্রতিধ্বনি তুলেছে, কি পরিমাণে ভাবী কালের মানুষের কাছে দেশের এবং কালের ব্যবধানকে অতিক্রম করে সত্যের বাণী বহন করে আনতে পেরেছে, তাই দিয়ে সাহিত্যকে বুঝতে এবং বিচার করতে হবে।

মার্ক্স-দর্শনের সমাজতত্ত্ব এবং তার ইতিহাসবাদ বিশেষ যুগের সঙ্গে, সে যুগের বাস্তব সামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে, তার সামাজিক জীবনযাত্রার সঙ্গে, সেই যুগের অতীত-বর্তমান-ধারাবাহী মনের যোগাযোগ বুঝ্‌তে সাহায্য করে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে যুগের বাস্তবকে এবং ব্যবহারিক বাস্তবের ওপর নির্ভরশীল সমাজমনকে (ব্যাপক অর্থে এই সমাজমনও বাস্তবের অঙ্গীভূত) সাহিত্য কি ভাবে প্রতিফলিত করেছে, তা' বোঝার উপায় হিসাবে মনোবিজ্ঞান বা এস্‌থেটিক্‌সের পরীক্ষিত সত্যগুলোকে অবলম্বন করে অগ্রসর হতেও বারণ করে না; বরঞ্চ তা করতেই উদ্বুদ্ধ করে। বিশেষ যুগের বিশেষ সাহিত্যকে, সাহিত্যর বিশেষ যুগ-স্রষ্টাকে, বিশেষ সাহিত্যিক বা কলাকারকে, শিল্পীকে বোঝার এবং বিচার করার ক্ষেত্রে মার্ক্সবাদ তাই নিছক অর্থনীতি বা অর্থনীতি-সর্বস্ব নীতিকে আশ্রয় করে অগ্রসর হবে না, অর্থনীতির সঙ্গে রাজনীতির এবং অর্থনীতি-রাজনীতির সাহিত্যকে বা সাহিত্য-কলার সরল-রেখানুগ প্রত্যক্ষ যোগাযোগ

প্রতিপাদন করতেও চাইবে না। ব্যাপক ও বিস্তৃত ইতিহাসবোধ এবং বাস্তব সমাজবোধের সঙ্গে মনোবিজ্ঞান ও এসথেটিক্‌স্‌-এর মূল্যবিচারের মাপকাঠিকে মিলিয়ে চল্‌তে হবে। কারণ, এঙ্গেল্‌সের কথায় মানস-সংস্কৃতির উচ্চতর পর্যায়ে ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য বা এসথেটিক্‌সের ক্ষেত্রে, মানুষের চিন্তাধারা সমাজের বাস্তব ভিত্তিমূল থেকে অনেক বেশী পরিমাণে দূরব্যবহিত হয়ে থাকে। ভাবধারার সঙ্গে বাস্তব জীবনযাত্রার পরিবেশের সম্পর্ক তাই অনেক বেশী জটিল এবং স্বভাবতই তা মধ্যবর্তী নানাধরণের আবরণ-অবগুণ্ঠনের সংযোগে অস্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। যে কোন যুগের মানস-সংস্কৃতি বা ভাবধারা নির্দিষ্ট রূপ নিয়ে দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা' যেমন নির্দিষ্ট ধরণের ধারণা-কল্পনা নিয়ে বিবর্তিত হয়ে থাকে, তেমনি সেই ধারণা-কল্পনাকে পরিশুদ্ধ, পরিমার্জিত করে এগিয়ে নিয়েও যায়, পরিবর্তিতও করে। মানস-সংস্কৃতি যদি একাজ না করত তা হলে তা' 'মানস'-সংস্কৃতি পদবাচ্য হোত না। নিজের নিজস্ব নিয়মে, স্ব-তন্ত্র ভাবে বিবর্তিত হওয়াই মানস-সংস্কৃতিব বৈশিষ্ট্য। ব্যক্তির বা ব্যক্তি-সমূহের দেশ-কাল ও সমাজ-বিধৃত মানসক্ষেত্রে, যুগ-মানস যে রূপ নেয়, তা 'in the last resort' ব্যষ্টির ও সমষ্টির জীবনযাত্রাব বাস্তব পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ই, কিন্তু এই নিয়ন্ত্রণ আস্‌ছে 'in the last resort' বা শেষাশেষি; প্রত্যক্ষভাবে নয়, অনন্যমধ্য ভাবে নয়। তাই, সমষ্টি মনের কাছে এ প্রক্রিয়া সাধারণত অজ্ঞাত থাকে। জীবন যাত্রার বাস্তব পরিবেশ যে মানস-সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে তাকে নিয়ন্ত্রণ করে, মানুষেব সচেতন মনের কাছে তা' ধরা দেয় না, বা জানা থাকে না (লুড্‌উইক্‌ ফয়ারবাখ্‌)।

পাঁচ

এঙ্গেলস এখানে যাকে মানস-সংস্কৃতির কাজ বা উপজীব্য বলে বলছেন—"occupation with thoughts as with independent entities, developing independently and subject only to their own laws"—সাহিত্যকলার ক্ষেত্রে একে যদি বুঝতে হয়, তাহলে মনস্তত্ত্বের যে নিয়মে চিন্তাধারা তার নিজের স্বতন্ত্ররীতিতে বিবর্তিত হয় তাকে বুঝতে হবে; যে নিয়মে জীবন যাত্রার বাস্তব পরিবেশ থেকে দূর-ব্যবহিত হয়ে সেই বাস্তব পরিবেশ এবং চিন্তাধারার মধ্যে অন্তর সৃষ্টি হয় তা' বুঝতে হবে, অচেতন এবং অবচেতন চেতনার কোন নিয়মে মানুষ তার চিন্তার ওপর বাস্তবের প্রভাব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ হতে পারে অথচ বাস্তবকে প্রতিফলিত করে না, তা' বুঝতে হবে; বুঝতে হবে কি ভাবে বিশেষ যুগে বিশেষ ধারণা-কল্পনাকে অবলম্বন করে মানুষের চিন্তাধারা বিবর্তিত হয়, কি ভাবেই বা স্বপ্ন-আবেগ-আনন্দ-বেদনা-সংবেদনার ভেতর দিয়ে মানুষের মন তাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। অর্থাৎ মার্ক্সবাদী সাহিত্য-সমালোচককে যেমন 'laws of motion of society' জানতে হবে, তেমনি তাঁকে জানতে হবে 'laws of motion of thought'। সমস্যাটা খালি সমাজ-বিবর্তনের নয়, মানস-বিবর্তনেরও। সমাজের বাস্তব পরিবেশ ও সমাজ-মানস পরস্পর সংশ্লিষ্ট এবং পরস্পর নির্ভরশীল বলে সাহিত্য-বিচারের ক্ষেত্রে সেই সংশ্লেষ এবং পরস্পর-নির্ভরতা প্রতিপাদন করাই মার্ক্সবাদী সমালোচকের একমাত্র কাজ নয়। সাহিত্যবেত্তা হিসাবে সমাজ-সংশ্লিষ্ট সাহিত্য আবার মানস-সাংস্কৃতির নিজের নিয়মে, নিজের কি স্বতন্ত্র রীতিতে অগ্রসর হয়, সেটা বোঝা এবং বোঝানোও

মার্ক্সবাদী সমালোচকের কাজ হবে। বৈজ্ঞানিক সমাজ-বোধের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক মনস্তত্ত্ব এবং এস্‌থেটিক্‌সের জ্ঞানও তাঁকে অর্জন করতে হবে, অর্জন করতে হবে গভীর মানবিক সহানুভূতি এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সংবেদনা-বোধ।

মার্ক্স এবং এঙ্গেল্‌স শেক্সপীয়র, গ্যেটে, বালজাক পড়তে খুব ভালবাসতেন। মিস্ হার্কনেসের কাছে লেখা এক বিখ্যাত পত্রে এঙ্গেলস বলছেন, বালজাকের রাজনৈতিক-সামাজিক চিন্তাধারা নিশ্চয়ই সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু তবু বালজাক মনের দিক দিয়ে তার শ্রেণীগত ও রাজনৈতিক সংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছিলেন, ঐ শ্রেণীর পতনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন; কারণ, তাঁর মতে মানুষের পক্ষে এর চেয়ে শুভ পরিণতি আর কিছু হ'তে পারে না। আর টলষ্টয় সম্পর্কে লেনিন বলেছেন, প্রকাণ্ড এক শিল্পী যাঁর তুলনা মেলা ভার; কিন্তু, অন্যদিকে, যীশুখৃষ্টের ধ্বজাধারী পুরোহিত। টলষ্টয়ের মধ্যে তিনি একদিকে দেখেছেন, রুশ কৃষক জীবনের অতুলনীয় প্রতিচ্ছবি, অন্যদিকে, অন্যায় প্রতিরোধ করার নিদারুণ অক্ষমতা। তথাপি, লেনিনের মতে টলষ্টয়-সাহিত্য হ'চ্ছে, "a step forward in the artistic development of all mankind."

বালজাক সম্পর্কে এঙ্গেলসের এবং টলষ্টয় সম্পর্কে লেনিনের মতামত থেকে এ তত্ত্বের সন্ধান মেলে যে কোন্ শ্রেণীতে কার জন্ম হ'লো, সেটাই শিল্পীকে জানার মানদণ্ড নয়, বিচার তার কর্মে, জীবনাদর্শে। কারণ, সামাজবিকাশের ধারায় মানুষ নিষ্ক্রিয় জড়-পদার্থ নয়; মনন এবং ব্যবহারিক কর্মের দ্বারা মানুষ পৃথিবীকে বদলায়, আর সাথে সাথে নিজেকেও বদলায়। জীবনাদর্শের পরিচয় যদি তার আসল পরিচয়

না হোত, তবে এঙ্গেলস্ নিঃসন্দেহে বালজাককে পারীর অভিজাত নাগরিক শ্রেণীর লোক, আর লেনিন টলষ্টয়কে সামন্ত ভূস্বামীর পুত্র বলেই পরিচয় দিতে পারতেন। সে ক্ষেত্রে বালজাক বা টলষ্টয়-সাহিত্যকে “a step forward” বলার কোন প্রশ্নও উঠত না।

এঙ্গেলস্ এবং লেনিনের অভিমত থেকে এটাও বোঝা যায় যে, সৃজনধর্মী মনের ভেতর দিয়ে বাস্তব পরিবেশের প্রতিফলন আদৌ যান্ত্রিক নয়। যে ধারা-উপধারা, যে ঘাত-সংঘাত বাস্তব জীবনে আমাদের প্রভাবিত করে হুবহু সেইটেই শিল্পে সাহিত্যে আমরা পাইনা—স্রষ্টার অনুভূতি আবেগ স্বপ্ন-কল্পনা, সংবেদনা, মননশীলতা, তাব বিশেষ দৃষ্টিকোণ, এতে পরিবেশেব রূপান্তর কিছু না কিছু ঘটেই। সেজন্যই বলা হয়েছে, শিল্পে-সাহিত্যে বাস্তব পরিবেশকে আমরা উচ্চতর তরঙ্গে ফিরে পাই। শিল্পে-সাহিত্যে এ প্রতিফলন এতো জটিল বলেই মার্ক্স-এঙ্গেলস্-লেনিনবাদ সাহিত্যকে তার সমসাময়িক সামাজিক এবং মানসিক ইতিহাসের বিস্তৃত অথচ তির্যক পরিপ্রেক্ষণে বিশ্লেষণ করে। খালি সাহিত্যিকের জন্মের নিরিখ এবং নিছক আর্থিক শ্রেণীস্বার্থ দিয়েই তার সাহিত্যের বিচার করে না।

ছয়

কিন্তু মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ যা করে না, অধ্যাপক স্মিবনভ মার্ক্স-বাদের নামে তা-ই করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে শেক্সপীয়র বর্ধিষ্ণু বুর্জোয়া শ্রেণীর একজন সচেতন সভ্য, আর সেজন্যই শেক্সপীয়রের পক্ষে বুর্জোয়া শ্রেণীর রাষ্ট্রিক এবং আর্থিক কর্মনীতি অনুসরণ করা স্বাভাবিক, আর এইটেই শেক্সপীয়রের অবিসংবাদী কৃতিত্ব যে, তিনি তা

ভাল করেই করেছেন। এই ভ্রান্ত মূলসূত্র থেকে যাত্রা সুরু করে অধ্যাপক স্মিরনভ শেক্সপীয়র-সাহিত্যকে একটা অর্থনৈতিক ফরমুলায় ফেলেছেন, এবং সে ফরমূলাকেই টেনে বাড়িয়েছেন। এতে সাহিত্য, সাহিত্যের সঙ্গে বাস্তব পৃথিবীর সম্পর্ক, মানুষের সাংস্কৃতিক-অভিযানের প্রবহমানতা এর কোনটাই আব টি'কলো না। কারণ, সাহিত্যকে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত করে না দেখলে, ঐতিহাসিক প্রবহমানতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে, আর বিশুদ্ধ বর্তমানের আর্থিক পরিবেশকে তার ধারক এবং বিচারের মূলকেন্দ্র করলে, যা কিছু এব মূল্য তা ততদিনই থাকবে যতদিন ঐ বিশুদ্ধ বর্তমান থাকবে। শেক্সপীয়রের ক্ষেত্রে, অধ্যাপক স্মিরনভের মতে শেক্সপীয়র বুর্জোয়াশ্রেণীর সচেতন প্রচারক বলেই, তাঁর মূল্য বুর্জোয়া-শ্রেণীর আয়ুষ্কালের সীমানা অতিক্রম করবে না; শেক্সপীয়ব সাহিত্যের সার্থকতাও বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থবোধ নির্ধারিত করবে। উপরোক্ত যুক্তি মেনে নিলে এ সিদ্ধান্তে না এসে উপায় নাই।

কোন সাহিত্যরসিক, যে কোনো মার্ক্সবাদী সাহিত্য-জিজ্ঞাসুও, এ সিদ্ধান্ত মেনে নিতে চাইবেন না। কারণ বুর্জোয়া দূরে থাকুক, এ যুগের সমাজ-বিপ্লবী শ্রমিক পর্যন্ত শেক্সপীয়র সাহিত্যের রসাস্বাদন করে। শেক্সপীয়রের এই কালজয়ী শাশ্বত আবেদন-ধর্মই শেক্সপীয়রের মহত্ব। সীমাহীন সম্ভাবনার পথে মানুষ চলেছে,—তার সামাজিক সংগঠন, শিল্পে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে, দর্শনে, বিজ্ঞানে মানুষ যে বিরাট সামাজিক সাংস্কৃতিক অঙ্গাবরণ সৃষ্টি করে তুলেছে, তার প্রত্যেকটির অবদান রয়েছে সে অভিযানে। যে যুগে শেক্সপীয়র লিখতে সুরু করেন, ইংল্যাণ্ডে তখন সামন্ত অভিজাততন্ত্র ক্ষয়িষ্ণুতার পথে চলতে সুরু করেছে। সামন্ত

বাজন্যদের ভৌমিক প্রভুত্ব আর ভূমিদাসদের দাসত্বের উপর যে সামাজিক ইমারত প্রতিষ্ঠিত ছিল, তা ভেঙ্গে পড়ছে, আর তার পরিবর্তে নতুন সামাজিক শ্রেণী, নতুন সামাজিক সম্পর্ক গড়ে উঠ্‌ছে। সে নতুন শ্রেণী হলো নাগরিক বণিক শ্রেণী, যাদের হাতে ধীবে ধীরে পুঁজি জমে উঠ্‌ছে। পুঁজির সাথে সাথেই আসে তার আত্ম-প্রকাশ প্রেরণা তাব স্বাতন্ত্র্যবোধ। কিন্তু শ্রেণী হিসাবে তখনও আদি পুঁজিপতিরা সামাজিক কর্তৃত্ব অর্জন করতে পারে নি, অথচ রাজনৈতিক আধিপত্য অর্জন করতে না পাবলে তার আত্ম-প্রকাশের পথ রুদ্ধই থাকবে। সুতবাং আত্ম প্রতিষ্ঠার তাগিদে নতুন বুর্জোয়া শ্রেণীর অভিপ্রকাশ হবে ঝড়েব মতো প্রচণ্ড, আর ঝরের মতোই পরিমিতিহীন। কারণ, সামন্ত সামাজিক সম্পর্ক ভেঙ্গে তাকে তাব নিজেব প্রকৃতি-সম্মত সামাজিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এ উদ্দেশ্যেই নতুন বুর্জোয়াশ্রেণী এবং রাজছত্রপতিদের মধ্যে সাময়িক বোঝাপড়া হযেছিল। এই অভিপ্রকাশের সামনে পচে-যাওয়া সামন্ত প্রতিভূদের দেখায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র, হেয়, আত্মসম্মান বর্জিত। আর প্রচলিত অর্থে যারা জনসাধারণ তাদের মধ্যে আছে অদ্ভুত দোদুল্যমানতা, অ-স্থিরচিত্ততা, আর জ্ঞানহীনতা ; কিন্তু তারা উপেক্ষণীয় নয়। কারণ তাদেব জীবনকে কেন্দ্র করেই আমরা ইতিহাসের বিচার করি, তার গতিশীলতার পরিমাপ করি ; কারণ ব্যক্তিবিশেষ ইতিহাসের ধারাকে প্রভাবিত করে, কিন্তু ইতিহাসকে বদলায় জনসাধারণ। এই সামাজিক পরিবেশের উপর এসেছিল উত্তর ইতালীর বণিকতন্ত্র নাগর-রাষ্ট্রপুঞ্জ হতে উদ্ভূত রেনেসাঁস-এব প্রভাব, সমসাময়িক ইংল্যাণ্ডের বিদগ্ধ সমাজের উপর ইতালীয় মানবতা-বাদীদের প্রভাব।

এই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ থেকে রস টেনে যে সাহিত্য গড়ে উঠেছে, যে সাহিত্যকে মানুষের ঐতিহাসিক যাত্রাপথে একটা বিশাল পদক্ষেপ বলে ধরতে পারি, তার স্বাদ এবং প্রকৃতি কি ধরণের হবে ?

সাত

এলিজাবেথ যুগের সাহিত্য বেশীর ভাগ নাটক আর কাব্য ; কিন্তু কাব্যে কাহিনী জড়িত। কাব্য অন্তর্মুখী, কাহিনী বহির্মুখী ; কাব্যে সমস্ত পৃথিবীকে আমরা ভেতরে টেনে আনি, আর কাহিনীতে সারা পৃথিবীতে আমরা ছড়িয়ে পড়ি। কাব্য-কাহিনী, দুটো লক্ষণই শেক্সপীয়র সাহিত্যে রয়েছে। অর্থাৎ, পুঁজির প্রথম সঞ্চয়ের যুগে পুঁজিবাদী সমাজের অর্থনৈতিক বিভাগ বর্তমান সময়ের মত প্রখর হয়ে দেখা দেয় নি,—নতুন শ্রেণীবিভাগের সূচনা মাত্র। সুতরাং, এ মিশ্রিত সমাজ পরিস্থিতিতে মিশ্রিত সাহিত্য দেখা দেবে, তা স্বাভাবিক। হ্যামলেট, লিয়র, এ্যান্টনী, ম্যাকবেথ, ওথেলোর মধ্যে আমরা পেয়েছি আত্ম-প্রকাশের সে প্রেরণারই অভিব্যক্তি যে প্রেরণা বল্গাহীন, যা কোন সীমা গ্রাহ্য করে না। আর সাথে সাথে পেয়েছি ফলস্টাফ, হটস্পারের মধ্যে জরিষ্ণু সামন্ত অভিজাততন্ত্রের অবজ্ঞার্হ প্রতিমূর্তি। আর অযুত-মস্তক জনগণের চরিত্রাঙ্কণে আছে সে চোখের পরিচয় যা থেকে গণ-চরিত্রের উপরে-বর্ণিত কোন লক্ষণই বাদ পড়ে নি।

কিন্তু এ পরিচয়ই কি যথেষ্ট ? টি, এস, এলিয়ট এলিজাবেথ যুগের সাহিত্যে সেনেকার প্রভাব আবিষ্কার করতে গিয়ে বলেছেন, লিয়র বা হ্যামলেটের মধ্যে আছে একটা 'পোজ' বা একটা 'এটিচুড' যার শেকড়

পাওয়া যাবে সেনেকা বা রোমান ষ্টোয়িসিজ্‌মের মধ্যে। শেক্সপীয়র সাহিত্যে 'রোমান' সেনেকার প্রভাব কতটা সে তর্ক না তুলেও একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, হ্যামলেট বা লিয়র চরিত্রের আসল পরিচয় আদৌ এটা নয়। শেক্সপীয়রের শ্রেষ্ঠত্ব, সমসাময়িক সামাজিক ও মানস পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর অন্তর্দৃষ্টির মহত্ত্ব এইখানেই যে, তাঁর প্রধানতম পরিচয় তিনি ট্র্যাজেডিয়ান। তাঁর ট্র্যাজেডির মর্ম হলো, যারা আত্মপ্রকাশ এবং আত্মসম্প্রসারণের জন্য স্পর্ধায় মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, চ্যালেঞ্জ করেছে সারা পৃথিবীকে ; যারা কৃষিজীবি ভৌমিক সামন্ত-সমাজের ব্যক্তিত্ববোধহীন সামাজিক নিগড় ভেঙ্গে নতুন সামাজিক সম্পর্ক গড়ে মানুষকে প্রাণ দিয়েছে, তাকে ব্যক্তিত্ববোধে উদ্বোধিত করেছে, তারাও পরিণামে পরাজিত হলো। কিন্তু এ পরিণামে দুঃখ নেই, এতে চোখে জল আসে না। কারণ, সামাজিক ব্যবস্থাকে তারা জয় করেছে, তার কাছে তারা হার মানে নি, তারা পরাজিত হলো যে সমাজ-ব্যবস্থা তারা নিয়ে এলো তারই অপরিহার্য মানস দ্বন্দ্ব এবং অন্তর্বিরোধের কাছে। তবু তারা ক্ষুদ্র নয়। মানুষের মধ্যে যে মুক্তির প্রেরণা আছে, সে প্রেরণা ভাষা পেয়েছে তাদের সংগ্রামের মধ্যেও, যেমন পেয়েছে শেক্সপীয়রের আমলের অপটু কৃষি আন্দোলনগুলোর (অধ্যাপক স্মিরনভের মতে, সে সব আন্দোলন ছিল প্রতিক্রিয়াশীল) মধ্যেও।

শেক্সপীয়র সাহিত্যের এ দিকটাই একে মানুষের সাংস্কৃতিক অভি-যানের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে, সেজন্যই কালান্তরে প্রবেশের মুখে বসেও আমরা শেক্সপীয়র পড়ে মুগ্ধ হই। আর এ অভিপ্রকাশের মধ্যে আমরা লেনিনের এ উক্তির মূল্য বুঝিতে পারি যে, একজন সত্যিকারের

স্রষ্টা বিপ্লবের কোন না কোন দিককে অভিব্যক্ত করেনই। আর এ থেকে এটাও বোঝা যায় যে, অধ্যাপক স্মিরনভ শেক্সপীয়রের যে পরিচয় দিয়েছেন,—অর্থাৎ, যে শেক্সপীয়র সচেতনভাবে তদানীন্তন বুর্জোয়াদের রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচী মেনে চলেছেন,—তা শেক্সপীয়রের আর যাই হোক পরিচয় নয়।

মোট কথা, ধনতন্ত্রের অভ্যুদয়ের প্রথম প্রত্যূষে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মানস-দ্বন্দ্বের গতিধারার সুদূর প্রসারী চিত্র,—এ ব্যবস্থার বিস্ময়কর সৃষ্টি থেকে সুরু করে এর অন্তর্নিহিত ব্যর্থতা পর্যন্ত—যদি শেক্সপীয়র তাঁর অদ্ভুত দূরদৃষ্টি আর তীব্র সংবেনশীল মানবিক সহানুভূতি দিয়ে প্রতিফলিত করতে না পারতেন, তাহলে শেক্সপীয়র যে অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠত্বের দাবী নিয়ে আমাদের সামনে আজো দাঁড়িয়ে আছেন, তা অর্জন করতে পারতেন না।

অগ্রহায়ণ, ১৩৫৪

প্রোপাগাণ্ডা ও সুন্দর

শিল্প জিজ্ঞাসা ও বিচারে দৃষ্টিকোণের প্রশ্ন অপরিহার্য, কিন্তু যে কোন দৃষ্টিকোণ থেকেই প্রথম প্রশ্ন উঠুক না কেন, এ ধরণের জিজ্ঞাসায় ব্যক্তি মনের পূর্ব-নির্ধারিত সংগঠণ যে বহু ক্ষেত্রেই অতি মাত্রায় প্রভাব বিস্তাব করে তা অনস্বীকার্য। যে সব জিজ্ঞাসাকে আমরা আত্মকেন্দ্রিক, ভাববাদী বলে সব সময় যথেষ্ট সম্মানও দেখাই নে, সে সব জিজ্ঞাসার প্রয়োগে ঐ সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা তো মিলবেই, এমন কি, আজ আমরা যে জিজ্ঞাসাকে সর্বগ্রাহ্য ও সর্বত প্রযোজ্য বলে ভাবছি, তাকেও ঐ অপরাধ থেকে বিমুক্ত করা সম্ভব হবে না। জিজ্ঞাসার পরিধি বিস্তৃত হয়েছে সত্য, কিন্তু এই বিস্তৃতি নবতর আতঙ্কও এনেছে, যার ফলে বিস্তৃতিকে আসর-জোড়া মর্যাদা না দিয়ে তার আসনকে সঙ্কুচিত করার প্রবৃত্তি জন্ম নিয়েছে। ফলে, যা পেয়েছি, যা জেনেছি, যা বুঝেছি বলে আত্ম-প্রসাদ লাভ করছি, তাকে হারাবার মতো পরিবেশও অজ্ঞাতসারে সৃষ্টি হয়ে চলেছে।

রসভারী মানুষ ভারে কাটে, আর বুদ্ধি প্রখরতায়। বুদ্ধি খরচ করে যে জ্ঞান অর্জন করতে হয়, তার প্রখরতা ছাড়াও আরেকটা দিক আছে, সেটা ব্যাপ্তির। কারণ, জিজ্ঞাসার এই ব্যাপ্তির

জোরেই দ্রষ্টা স্রষ্টা হয়, ইতিহাসের প্রবহমান ধারায় নিয়ন্ত্রিত হয়েও মানুষ সে ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে। আধুনিক জিজ্ঞাসার এই ব্যাপ্তি মানুষের সামাজিক-সাংস্কৃতিক মূল্যবোধে রূপান্তর এনেছে। আমরা জেনেছি, যে সমস্ত আপাত-পরস্পরমুখী উপাদানের ইমারতের জোরে সভ্যতা-সংস্কৃতির ভিত্তি রচিত, তাদেব একটিও স্বয়ম্ভূ বা স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়; জ্ঞানের একটি বিভাগের জিজ্ঞাসার মীমাংসায় বহু বিভাগের বিকাশধারার মূল সূত্র নিয়ে আলোচনা করতে হয়, বহু ধারার স্রোত এসে একক অনন্ত মীমাংসা সমুদ্রে মিলিত হয়। এ ভাবে যে জানা, তারই কেবল স্বার্থকতা লাভের সম্ভাবনা আছে।

কিন্তু এই পরিব্যাপ্ত জানার আশঙ্কা এই, দেখা গেছে ব্যাপ্তির বিশালতার আবহাওয়ায় অবগাহনে অক্ষম সমালোচকের জীবনে ইহা মানসিক কার্পণ্য নিয়ে আসে। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে বুদ্ধির প্রক্রিয়াকে বহুধা প্রসারিত কবতে না পারায় যারা বিকলাঙ্গ, তাদের এই মনস্তাত্ত্বিক কার্পণ্য শিক্ষাপ্রদ। কারণ, কর্ষণের অভাব হলে যে পরিণামে বিকর্ষণ দেখা দেয়, এ শিক্ষার গুরুত্ব অবহেলার নয়। ব্যাপ্তিকে আত্মস্থ করতে না পারলে তাকে পিষে ছাঁচে-ঢেলে সাজানোর সহজ মনোবৃত্তি অনিরুদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়। ব্যাপ্তিটা তখন কথার কথা, প্রলোভনের ইসারা মাত্র, খোদাই-করা ছাঁচটাই সে সময় অধিকতর মূল্যবান মনে হয়। কিন্তু এই মূল্যের বেশীটাই যে ফাঁকি, গিল্টির অত্যুগ্র ঝকমকিতে চোখ ঝলসানো, সেটা চোখ থেকেও দৃষ্টিগোচর হয় না।

আধুনিক জিজ্ঞাসার প্রকার ও পদ্ধতি থেকে উদাহরণ দিই। সমাজ-বিজ্ঞানীদের মতে, সমাজ স্থিতিশীল নয়, গতিশীল; সমাজ-

অন্তর্নিহিত বিরোধী শক্তিসমূহের প্রক্রিয়ার ফলেই এই বিবর্তন চলেছে; প্রকৃতির মধ্যেও সেই একই বিবর্তনের ধারা। ঐ বিরোধী শক্তি সমূহের ধারণা-কল্পনা, কার্যক্রম, সমাজের বাস্তব পরিবেশ, অর্থ-নৈতিক সংগঠন কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়,—প্রত্যক্ষভাবে নয়, শেষাশেষি, **in the last resort.**

কিন্তু সর্বশেষ উল্লিখিত সর্তটিকে যদি বাদ দিই তাহ'লে অবস্থাটা দাঁড়ায় এই—একটি বিশেষ যুগের সমসাময়িক অর্থনৈতিক সংগঠন সামাজিক শক্তিসমূহের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে। সমাজ শ্রেণী বিভক্ত, বিভিন্ন শ্রেণীর পারস্পরিক সম্পর্ক বিচিত্র। কিন্তু যেহেতু এই বিচিত্র অর্থনৈতিক সম্পর্কের অঙ্কের পরিমাপেই মানুষের মানস-ক্রিয়ার পরিচয়, তাই বলা চলে, উপস্থিত গরজের তাগিদ আছে মানুষের যে ক্রিয়ার পশ্চাতে, বা আপাত দৃষ্টিতে গরজের তাগিদ মেলে না যে সব ক্রিয়াতে, তারও সবটাই পূর্ব থেকে নির্ধারিত। কারণ, শ্রেণীগত অর্থ নৈতিক স্বার্থ প্রণোদনেই তার মানসের সৃষ্টি।

এই দৃষ্টিকোণের অভিব্যক্তিতে উক্ত সমাজবিজ্ঞানীদের সূত্র থেকে যে বিচ্যুতি ঘটেছে, তা স্বীকার্য। শিল্প জিজ্ঞাসায় এব বক্তব্য নিম্ন রূপ, শিল্পী আর যা-ই হোক প্রথমে মানুষ, এবং সামাজিক মানুষ। সামাজিক অর্থাৎ শ্রেণীগত মানুষ বলেই (যে শ্রেণীতে তার জন্ম), শিল্পী ঐ শ্রেণীর সাথে সমস্বার্থবোধে আবদ্ধ। দার্শনিক তত্ত্বের ভিত্তিভূমিতে ঐ স্বার্থবোধের কাঠামো রচিত। শিল্প-সাহিত্যের সংজ্ঞা যদি হয়, বাস্তব সামাজিক সত্যের প্রতিফলন, আর শিল্পীর ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-সংবেদনা এই প্রতিফলনের রূপান্তর কোন না কোন ভাবে ঘটায় বলে স্বীকার করি, তা হ'লে স্থির সিদ্ধান্ত এই

হয় যে, ঐ তত্ত্বজাত শ্রেণী স্বার্থবোধ শিল্পীর সৃষ্টির মাধ্যমে অভিব্যক্ত হয়ই হয়। অর্থাৎ, সৃষ্টিতে অভিনব স্বার্থ-সৃষ্টি, এই হলো সৃজনশীলতার পরিচায়ক। সুতরাং, সব আর্টই প্রোপাগাণ্ডা। প্রোপাগাণ্ডার ব্যবহার হলো এই অর্থে, শিল্পে যে সাংস্কৃতিক-সামাজিক মূল্যবোধের সৃষ্টি, তা বিশেষ দার্শনিক (অতএব শ্রেণী-স্বার্থের) তত্ত্বের ধারক ও বাহক, এবং সবিশেষ তত্ত্বের নাশক। পূর্বে আধুনিক জিজ্ঞাসার যে ব্যাপ্তির কথা উল্লেখ করেছি, এক্ষেত্রে তাকে ঠেলেঠুলে একটা সঙ্কুচিতর গহ্বরে নিক্ষেপ করা হয়েছে: সামাজিক শ্রেণীগত স্বার্থ—শিল্পী—বাস্তব পরিবেশ—সৃজনশীলতায় শিল্পীর মানসিক প্রকরণ—সৃষ্টি=শ্রেণীগত স্বার্থতত্ত্বের প্রোপাগাণ্ডা। উপস্থিত গবজের প্রত্যক্ষ তাগিদের সূত্রানুসারেই সমস্ত সৃষ্টির সার্থকতা বা অসার্থকতা বিচার করা হবে; যাকে এই অঙ্কের সংখ্যায় ধরা গেল না, তাকেই বলা হলো অসার্থক, অথবা বলা হলো, শিল্পীর এবম্বিধ মানসিক বিকৃতি ঘটেছে।

আমার প্রশ্ন, শিল্পের এবং শিল্পীর মানসিক প্রকরণের এই পরিচয়ই যথেষ্ট কিনা, বা এই পরিচয় আসল পরিচয় কিনা। সৃজনশীল মানসক্রিয়া কি শুধু প্রোপাগাণ্ডার মনোবৃত্তি প্রসূত। অর্থ নৈতিক মুক্তি-সংগ্রামে লিপ্ত মানুষের মানস-সংস্কৃতির আর কোন দিকে চোখ ফেরানোর অবসর, প্রবৃত্তি বা অধিকার কি নেই? আমি এখানে যে মনোভাবের কথা বোঝাতে চেষ্টা করছি অবনীন্দ্র-নাথের ভাষায় তার পরিচয় দেবার লোভ সামলাতে পারছি না; "হঠাৎ পূব কি পশ্চিম আকাশ রঙ্গে রাঙ্গা হয়ে উঠলো; দৃষ্টির সঙ্গে মন যুক্ত হয়ে দেখে কি হল; পাড়ায় ট্রামের ঘণ্টার টুং টাং

এর উপরে হঠাৎ কোন সকালে বাঁশীর স্বর বাজলে মন বলে ওঠে, কি শুনি? হঠাৎ দক্ষিণ বাতাস ঘরের ঝাপটা নাড়িয়ে দিলে, মন যেন ঘুম ভেঙ্গে চমকে বলে, শীত গেল নাকি দেখি! পাড়ার যে ছেলেটা প্রতিদিন বাড়ির সামনে দিয়ে ইস্কুলে যায় তাকে দু'এক দিনেই চিনে নিয়ে চোখ ছেলেটাব দিকে ফেরা থেকে ক্ষান্ত থাকে; কিন্তু সেই ছেলেটা হঠাৎ বাঁশী বাজিয়ে বর সেজে দুয়োর গোড়া দিয়ে শোভাযাত্রা করে যখন চলে তখন মন শ্রবণ সবাই দৌড়ে দেখতে চলে—আব সেই দেখাটাই মনের মধ্যে লুকোনো রস জাগিয়ে দেয় হঠাৎ" (বাগেশ্বরী .শিল্প-প্রবন্ধাবলী)। এই রসবোধের অধিকার, অথবা উপস্থিত গরজের তাগিদ নেই এমন আনন্দ রসে অবগাহন করার অধিকাব আজকের দিনেব জটিল সংগ্রামে রত মানুষেব আছে কি নেই। অথবা, যে শিল্পসৃষ্টি মানুষেব সংজাত বা স্বাভাবিক আনন্দবোধের প্রেরণায় উদ্ভূত, এবং যা শুধু শিল্পীর আনন্দিত বিমোহিত মানস-ক্ষেত্রের অতুলনীয় অভিব্যক্তিরূপে আত্ম-প্রকাশ করে, সে সৃষ্টি আজকের পরিব্যাপ্ত জিজ্ঞাসাব মানদণ্ডে সুবিচার আশা করতে পারে কি না, বা শিল্পীকে বাস্তববোধহীন পলাতক বলে পরিচয় দেওয়া ছাড়া আর কোন পরিচয় তার হ'তে পারে কি না।

সব জিজ্ঞাসারই সার কথা নিজেকে জানো, আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জন করো। আমাদের বিজ্ঞানী দৃষ্টিতে প্রকৃতিকে জানার যে জিজ্ঞাসা, আর নিজেকে জানার তাগিদে যে সমাজ-জিজ্ঞাসা, সাহিত্য জিজ্ঞাসা, পরিশেষে শ্রেণীগত সামাজিক পরিবেশে যে অর্থনৈতিক সংগ্রাম, তা সবই এই পরিধিগত। নিজেকে জানার

প্রধান কথা, মনের সংবেদন ক্ষেত্রেব প্রসার। আমাদের বহুবিধ কর্মই এই প্রসারণে সহায়তা করছে। অর্থনৈতিক চেতনা ও তাতে সিদ্ধিলাভ করেই যে তার অধিকারী আমরা হতে পারি তা নয়; মানস-সংস্কৃতির যতো বিভিন্নমুখী দিক আছে, যতো বিচিত্র জিজ্ঞাসা আছে, জীবন-চর্যার যতো দিক আছে, তার মীমাংসার ফসলে কিছু পরিমাণেও ভোগদখল বসাতে না পারলে, প্রসারণের কাজ ব্যাহতই হবে। আর সব কটা ধারাকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র একটি ধারার স্রোতে গা ভাসালে যে মানস-ক্ষেত্র রূপ নেবে, তার অসম্পূর্ণতা তো প্রত্যক্ষ। এমনিধারা যার বিকাশ, তাকে মানসিকবৃত্তির বিচারে কোন মতেই চৌকস বলা যেতে পারে না। আর তার আত্ম-প্রতিষ্ঠার অভিযানও হবে বিকৃত, চোরাবালিতে ভাসান যাত্রা। সে জন্যই একদেশমুখীন প্রসারকে জানার উপযুক্ত পথ না বলে অপ্রশস্ত পথ বলা হয়েছে। কারণ, অর্থনৈতিক সমাজ-বিবর্তনের সংগ্রাম-চেতনাই একমাত্র সমস্যা নয়, মানস বিবর্তনের চেতনাও থাকা চাই। মানুষের জীবনের, সংস্কৃতির বা সমাজের রূপটা সামগ্রিক। সুতরাং যখন জীবনের সংস্কৃতির অথবা সমাজের বিচার হ'বে, তখন সামগ্রিক-ভাবেই তাব মীমাংসা করতে হ'বে। অর্থাৎ মানুষের একরূপ থেকে আরেকরূপে যাওয়া, বা তার আত্মপ্রতিষ্ঠার রূপটাও সেজন্য সামগ্রিক। এ চেতনার অভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা সম্পর্কে অনবহিত থাকাই স্বাভাবিক।

মনে হয়, এ সম্পর্কে দ্বিমত নেই। তা হ'লে আজকের জটিল অর্থনৈতিক সংগ্রামে লিপ্ত মানুষের রসবোধে যে শুধু অধিকার আছে তা নয়, তার বৃহত্তর মুক্তির তাগিদেই রসের চর্চা এবং চর্যাও দরকারী। কিন্তু যাঁরা উপরোক্ত অঙ্কের ফরমুলা অনুযায়ী

সমস্ত জিজ্ঞাসার মীমাংসার পথ খোঁজেন, তাঁরা এই চর্চার মধ্যে এমন একটা মানসিক বৃত্তির প্রকরণ দেখতে পান যেটা, তাঁদের মতে, মানুষের সর্বাঙ্গীন মুক্তির পরিপূরক নয়। এবং তাঁরা এর অন্তর্নিহিত ভাবধারায় এমন একটি দার্শনিক তত্বের অভিপ্রকাশ দেখতে পান যাতে সনাতন বৃত্তির, মুক্তি-বিমোখীন আদর্শের প্রোপাগাণ্ডাই নাকি ধরা পড়ে। তাঁদের অসম্মাননা না করে বলা চলে, তাঁরা জীবনকে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক সংগ্রামের সূত্রের মধ্যে মানুষের জীবনের সামগ্রিক স্বরূপকে সঙ্কুচিত করতে চান।

সব আর্ট প্রোপাগাণ্ডা কি না, আরেক দিক থেকে তার বিচার করা যাক। আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রেরণা, বা মুক্তির প্রেরণা সর্বকালীন মানবিক বৃত্তি। কিন্তু সমাজবিবর্তনের বিশেষ বিশেষ স্তরে মানব-মুক্তি বিশেষ বিশেষ ব্যবহারিক অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক রূপ ধারণ করে। যেমন বাজতন্ত্র, নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র, পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি—এই ব্যবহারিক রূপের গূঢ় দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা করলে আমবা বলতে বা নির্ধারণ করতে পারি, সমাজের কোন শ্রেণী ঐ বিশেষকালে আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে, আর কারা সেই প্রতিষ্ঠা অর্জনের পথের সমস্ত জঞ্জাল সাফ করার কাজে নিয়োজিত থেকেও তাতে অধিকারী হতে পারলো না। কিন্তু এই ব্যর্থতার ফলেই তার মুক্তির প্রেরণা নিঃশেষিত হলো না; কারণ যাত্রা তার থামেনি। অর্থাৎ বিভিন্ন ব্যবহারিক রূপের অন্তরালে যে গোপন কথাটি আছে—মানুষ মুক্তি চায়—সে সত্যটি চিরন্তন সত্য। মুক্তির এই ব্যবহারিক আকৃতির প্রতি (যেটা ক্ষণস্থায়ী) অভিনিবিষ্ট না থেকে, যে সত্যটা সর্বকালীন যদি তাকে সৃষ্টির

পরিধিতে ধরা যায়, তা হ'লে তাকেও প্রোপাগাণ্ডার সূত্রে পরিমাপ করার সার্থকতা কোথায় অথবা যায় কি ? অথবা তাকে সর্বমানবিক মুক্তির অভিব্যক্তিরূপে গ্রহণ না করে বিশেষ শ্রেণীর মুক্তির প্রতি-ফলনরূপে বিচার করার প্রয়োজন কি ?

আমার কথার দৃষ্টান্ত হিসাবে বাংলা দেশের নবতম কবি গোষ্ঠীর একজনের সম্প্রতি প্রকাশিত একটী কবিতা নিয়ে আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যাক্।

এখন অস্ফুট আলো। ফিকে ফিকে ছায়া অন্ধকারে
অরণ্য সমুদ্র হ্রদ রাত্রির শিশিরসিক্ত মাঠ
অস্থির আগ্রহে কাঁপে, আসে দিন ; কঠিন কপাট ;
ভেঙ্গে পড়ে। দুর্বিনীতি দুরন্ত আদেশ শুনে কারো
দীর্ঘ রাত্রি মরে যায়, ধ্বসে পড়ে জীর্ণ রাজ্যপাট ;
নির্ভয় জনতা হাঁটে আলোর বলিষ্ঠ অভিসারে।
হে এশিয়া রাত্রি শেষ, ভস্ম অপমান শয্যা ছাড়ো,
উজ্জীবিত হও রূঢ় অসঙ্কোচ রৌদ্রের প্রহারে।

সহরে বন্দরে গঞ্জে গ্রামাঞ্চলে ক্ষেতে ও খামারে
জাগে প্রাণ, দ্বীপে দ্বীপে মুষ্টিবদ্ধ আহ্বান পাঠায় ;
অগণ্য মানবশিশু সেই ক্ষিপ্র অনিবার্য ডাক্
দুর্জয় আশ্বাসে শোনে, দৃঢ় পায়ে হাঁটে। তারপরে
ভারতে সিংহলে ব্রহ্মে ইন্দোচীনে ইন্দোনেশিয়ায়
বীতনিদ্র জনস্রোত বিদ্যুত উল্লাসে নেয় বাঁক।

(এশিয়া—নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ; ক্রান্তি—কার্তিক ১৩৫৪)

সনেটের পরিশুদ্ধ কাঠামোর মধ্যে এখানে যে পরিমিত ভাব এবং ভাব ও ভাষার গতির মধ্যে যে পরিমিত সঙ্গতি ধরা পড়েছে, এবং যার ফলে অপরিমিত রসেব সৃষ্টি হয়েছে, বাংলা সনেটে তার সমকক্ষ খুব কমই আছে। কিন্তু এর চমৎকারিত্ব নিয়ে আলোচনার লোভ থাকলেও অবকাশ নেই, কারণ এখানে বিষয়বস্তু স্বতন্ত্র। এশিয়া জেগে উঠেছে, দীর্ঘ সাম্রাজ্যবাদী শোষণের অন্ধকার বিলীন হতে চলেছে; মুক্তির আনন্দে এশিয়ার বাতাস কম্পমান। কিন্তু পূর্বে সমাজ বিবর্তনের যুগে যুগে মুক্তির যে ব্যবহারিক রূপের কথা উল্লেখ করেছি, তার সন্ধান এ কবিতায় নেই; অর্থাৎ, এশিয়া জেগে উঠেছে সত্য কিন্তু কি ভাবে জেগে উঠেছে, কোন ব্যবহারিক রূপের আশ্রয়ে কোন বিশেষ সামাজিক শ্রেণী বা শক্তিকে অবলম্বন কবে এশিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ খুঁজবে, তার সাক্ষাৎ এখানে মেলে না। আর খুব টানা-হ্যাঁচরা না করলে কবির রাজনৈতিক মতবাদ সম্পর্কেও প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া এ ক্ষেত্রে দুষ্কর। তথাপি কি আমবা বলতে পারি, কবি অমুক মতবাদ বা আদর্শ খণ্ডন কবে অমুক আদর্শের ধারক ও বাহক হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছেন? অথবা কি বলা যেতে পারে, কবির মানসিক সংগঠনে অমুক আদর্শের প্রতি অনুগত্য রয়েছে বলে, অথবা কবিতায় তার অভিব্যক্তির ছাপ রয়েছে বলেই, তা সার্থক? আমার মতে, এতে সমাজ মুক্তির বিশেষ কোন ব্যবহারিক রূপের প্রতি অর্থাৎ বিশেষ কোন শ্রেণী কাঠামোর প্রতি অভিনিবেশ ও আনুগত্য প্রকাশ পায়নি, প্রকাশ পেয়েছে মানুষের সর্বকালীন মুক্তি-প্রেরণার প্রতি অবিচল বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা, আর এমনি করেই তা প্রোপাগাণ্ডার উর্ধ্বে মানবিক মূল্যবোধের স্থায়ী আসরে সহজ পরিণতি লাভ করেছে।

সৃষ্টির সার্থকতা বিচারের এও একটা সূত্র যে, সার্থক সৃষ্টি রস-পিপাসুর মানস-ক্ষেত্রে একটা নতুন attitude-এর উদ্বোধন করে। আমি যা আছি, সার্থক শিল্প-অভিজ্ঞতার পরেও যদি আমি তাই থাকি, তাহ'লে যেমন বুঝতে হ'বে আমার রসাস্বাদনে কোথায়ও কোন দুর্বলতা আছে, তেমনি যে সৃষ্টি আমার মানসিক সংগঠনে কোনরূপ রূপান্তর ঘটাতে পারে না, তার সার্থকতা সম্পর্কেও প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। আলোচ্য কবিতা সম্পর্কে সে প্রশ্নের অবকাশ নেই। এ কবিতার পাঠান্তে ব্যবহারিক জীবনের নানা অসঙ্গতি এবং শৃঙ্খলাহীনতা অতিক্রম করে একটা সুউচ্চ প্রেরণার স্পন্দন বা অনুরণন শুনি মনে, যে প্রেরণা আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জনের। আর একেই আমি সর্বকালীন মানবিক মূল্য-বোধের পর্যায়ভুক্ত করেছি। বিশেষ কোন আদর্শের হয়ে প্রোপাগাণ্ডা করেনি বলে এ কবিতা অসার্থক নয়।

এবার আরেক দিক থেকে একই প্রশ্নের বিচার করা যাক। সুন্দরের রূপ লক্ষণ এসব নিয়ে বিস্তর মতভেদ থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু সুন্দরের প্রতি আমাদের প্রত্যেকের যে প্রবল আকর্ষণ আছে, আর সুন্দরের চর্চা এবং চর্যা যে আমাদের আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জনের সংগ্রামের অপরিহার্য অঙ্গ, এ নিয়ে মতবিরোধ নেই আশা করি। সে কথা মনে রেখে শ্রীযুক্ত অজিত দত্তের 'পলাতক' কবিতাটি পড়া যাক।

চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ জ্বালিয়ে
গেলো পালিয়ে।
গেলো সে পালিয়ে কোথা—কদ্দূর?
পেরিয়ে সমুদ্দূর

পেরিয়ে আকাশ—ভরা তারা,
পার হয়ে গেলো চাঁদ চোখের পাহারা,
মনের খুকুকে চুপে ঘুম পারিয়ে
গেলো চাঁদ দেশ ছাড়িয়ে।

কপালে চুমোর টিপে লিখন এঁকে
গেলো চাঁদ কোথা জানে কে?
গেলো কি সে পশ্চিমে তুষার দেশে?
গেলো সে ভেসে?
সেই শাদা দেশে বুঝি শাদা কপালে
চাঁদ মামা টিপ্ লাগালে?

গেলো চাঁদ, গেলো পালিয়ে
আঁধার কপালে টিপ্ দীপ জ্বালিয়ে
গেলো কি সে আমাদের আকাশ হতে
কালো এক ঝড়ের স্রোতে?
রাত আর কতো বাকি?
মনের খুকু ঘুম ভাঙবে না কি?
কালো রাত কাটবে না কি?

চাঁদের কপালে কেন টিপ্ জ্বালিয়ে
চাঁদ চুপে গেল পালিয়ে

ক্লান্ত অবশ চোখে জাগে পাহারা
তন্দ্রাহারা,
ছন্দহারা-
চোখের তারা।

আধার কপালে কেন টিপ্ জ্বালিয়ে
দুষ্টু চতুর চাঁদ গেলো পালিয়ে?

এটা আমাদের অভিজ্ঞতার অতি সাধারণ একটা দিক, অতি পরিচিত দেখা। আর এ কয়টা লাইন যে ভাবে মনে রেখাপাত করে, তা অতি পরিচিত ভাবানুষঙ্গ বা মনোবিদরা যাকে বলেন stock response তাকে কেন্দ্র করেই গঠিত। এইখানেই আমাদের বক্তব্য বা সমালোচনা পরিসমাপ্ত করা যেতে পারতো যদি না কবির আপন সত্ত্বা কবিতার প্রতি চরণের সত্তা আর গতির মধ্যে অনুপ্রবেশ করে অতি পরিচিতকেও অপরিচিতের মাধুর্যে, দৃষ্টিকে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অভিসিক্ত না করতো। বক্তব্য বা আদর্শের দিক থেকে এ কবিতার দেবার কিছু নেই, নেই কোন ব্যবহারিক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক তাগিদের প্রোপাগাণ্ডাও। যা আছে, তা হলো বিশেষ একটা মানস-ক্ষেত্র, যেখানে পরিচিত অভিজ্ঞতা নতুন ভাবে ধরা পড়েছে, একটা বিশেষ ভাবে ও ভঙ্গীতে, এবং যা এই বিশেষ ভাবে ও ভঙ্গীতে বাঁধা মানস ক্ষেত্রের রসোপলব্ধির আহ্বান জানায়। এখানে প্রথম দৃষ্টিতেই ধ্বনির যে প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়, তা আমাদের মনে যে চিন্তা ও ভাবানুবেগ সৃষ্টি হয়, তার অভিক্ষেপ (projection) মাত্র, আর এতে আমাদের কানের যে পরিতৃপ্তি, তা-ও আমাদের মনের ভাব সংগঠনের প্রতিবিম্ব। ধ্বনির গুরুত্ব খুব

বেশী হ'লেও, একলা ধ্বনি এই মাধুর্য সৃষ্টি করতে পারতো না। ধ্বনি আর ভাব, এ দুয়ের সংমিশ্রণেব ফলেই এব বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু প্রশ্ন, এই অভিজ্ঞতা এবং একে কাব্য রসে সিঞ্চিত করার সার্থকতা কি, আর কেনই বা এই সার্থকতা। আগেই বলেছি, মানুষের জীবনচর্যার রূপকে বলতে পারি একটা প্রবাহ; বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধারা এসে মিলিত হয়েছে এখানে; আর এই মিলনের ফলেই এই প্রবাহের সৃষ্টি। এই প্রবাহে মানুষেব অর্থনৈতিক মুক্তি প্রেরণা যেমন একটি বিশেষ ধারা, তেমনি তার সাংস্কৃতিক অগ্রগতিও আর একটি বিশেষ ধারা। এই দুটো ধারা মিলে আবার মানুষের আত্মজ্ঞান ও আত্মজয়ের স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টি কবে। অর্থনৈতিক মুক্তিব রূপ যেমন মানুষের ধারণা-কল্পনা-মনন-সংবেদনাকে প্রভাবিত করে, তেমনি মানুষ যদি তার ধারণা-কল্পনা-মনন-সংবেদনার সৌকুমার্যে অর্থনৈতিক মুক্তি প্রেরণাকে সঞ্জীবিত করতে না পারে তো কোনরূপ মুক্তির অনুপ্রেরণাই তার সুস্থ সহজ স্বাভাবিক রূপ ধারণ করতে পারবে না। এই দিক থেকেই সাক্ষাৎ গরজের বা utilityর ব্যাকুলতা নেই এমন অভিজ্ঞতা ও এমন বসসৃষ্টির সার্থকতা। এতে মনের পরিধি বিস্তৃত হয়, উপলব্ধির তীক্ষ্ণতা বৃদ্ধি পায়, মানস-ক্ষেত্রে সাবলীলতা আসে। অর্থাৎ যে কোন সার্থক অভিজ্ঞতার মতোই এতে নতুন attitude এর সৃষ্টি হয়। সুন্দর এবং সুর বলতে সাধারণত আমরা যা বুঝি এবং উগ্র অর্থনৈতিক চেতনা যে বৃত্তিগুলি সম্পর্কে আমাদের মধ্যে অবজ্ঞা ও অবহেলার ভাব এনে দিয়েছে তার সার্থকতা এই জন্যে যে, যে কোন প্রত্যক্ষ বৈজ্ঞানিক নির্ণয়, সাফল্য বা অর্থনৈতিক বিবর্তনের নূতন পর্যায় সৃষ্টির সাফল্যের মতোই এরাও মানবিক মূল্য সৃষ্টি করে, আর এই মানবিক

মূল্য—যথা সৌন্দর্যবোধ, ভালবাসা বোধ, মুক্তি-বোধ ইত্যাদি—সহজেই দেশ কালের সীমানা অতিক্রম করতে পারে। অর্থাৎ মানুষকে তার ব্যক্তি-সীমা বা দেশ-সীমা থেকে টেনে বের করে বিশ্ব-সীমায় নিয়ে যাওয়ার কাজে এদের দান অপরিহার্য। সে জন্যই এই সব মানবিক সত্যের চর্চা ও উপলব্ধি মানব-ইতিহাসে স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করে রয়েছে।

কিন্তু অর্থনৈতিক অতি-চেতনার ফলে এই দিকটার প্রতি যথেষ্ট দৃষ্টি না পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। উপরোক্ত কবিতার আলোচনায় চেতনার মাত্রা হারিয়ে সহজেই শ্রীযুক্ত দত্তকে পলাতক, বাস্তব সামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অন্ধ, ইত্যাদি বলে অতি সচেতন ব্যক্তিদের মতে বিচার, আর আমার মতে অবিচার, করতে পারি। তবে অভিজ্ঞতার বিচারে ও কাব্যের মূল্য নির্ধারণে এই মনোভাবের গুরুত্ব কতখানি সে প্রশ্ন সঙ্গত ভাবেই ওঠানো যেতে পারে। সমালোচনা যখন এই ধরণের খাতে প্রবাহিত হয় তখন স্বভাবতই আরেকটা সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, যেদিকে দৃষ্টি ফেরানো অন্যায় বা উচিত নয় কবি সেই নিষিদ্ধ স্থানে পরিভ্রমণের দোষে পাতকী। সমালোচকের এই মনোভাব কি সুস্থ? ধরে নিলাম, অমুক শিল্পী বাস্তব সত্য সম্পর্কে অচেতন সুতরাং তার পক্ষে এমনি ধরণের হালকা বিষয়ে আত্মভোলা হয়ে পড়ে থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু যে শ্রমিক দিনের পর দিন ধর্মঘট চালিয়ে যাচ্ছে অথবা যে সৈনিক সমাজতন্ত্রের হয়ে সমরক্ষেত্রে আত্মদান করতে এগিয়ে গিয়েছে, তার মধ্যে সুন্দরের ও সুরের চেতনা বা ভালবাসা বোধের অভিপ্রকাশ কি নিয়মের ব্যতিক্রম? এবং যার মানসিক বৃত্তি বলে কোন পদার্থ নেই, সংবেদনশীলতা নেই, সেই কি এক্ষেত্রে

আদর্শস্থানীয়? উদাহরণ দিয়ে বলি, সমরক্ষেত্রের কামানগর্জনের মুখে সৈনিক চিঠি লিখলে, আজকের এই সন্ধ্যায় অকস্মাৎ অদ্ভুত ভাল লাগলো আর বার বার মনে হলো ভালবাসি তোমায়। আর কারখানায় ধর্মঘটরত প্রিয়তমার সেই চিঠি পড়া আর শেষ হয় না। পড়ে পড়ে মুখস্থ হয়ে গিয়েছে, চোখ বুজে প্রতিটি অক্ষরের চেহারা সে বলে দিতে পারে, তবু দিনান্তে অন্তত বার কয়েক চিঠি না পড়লে ভাল লাগে না। আর যুদ্ধ থেকে কেউ ফিরে এলেই জিগ্যেস করে 'যুদ্ধের খবর কি বলো।' এই যে হৃদয়বৃত্তি, আর আগে অবনীন্দ্রনাথের কথায় যে হৃদয়বৃত্তির কথা বোঝাতে চেয়েছি, সে হৃদয়বৃত্তি কি সংগ্রামশীল মানুষের মানসক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত নয়? অথবা অন্তর্ভুক্ত হলেও এর সংস্পর্শ থেকে যতই বিমুক্ত থাকা যায় ততই কি মঙ্গল?

আমার মতে এই হৃদয়বৃত্তি মানুষের মানসক্রিয়ার প্রবাহের অন্তর্গত তো বটেই, এর চর্যা ও পরিচর্যাও মানসিক প্রকরণের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আর তাই যদি হয়, তা হ'লে এ নিয়েও চেতনার পরিমিত বোধ না হারিয়ে সার্থক শিল্পসৃষ্টি সম্ভব এবং হওয়া উচিত। আর এ কথা মানলে এটা মানতেও আপত্তির কারণ নেই যে, মানবিক মূল্যবোধের অভিব্যক্তি হলেও সমস্ত সার্থক সৃষ্টিই প্রোপাগাণ্ডা নয়। অবশ্য এতে অর্থনৈতিক অঙ্কের সূত্র এবং সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে মানস বৃত্তি বিচারের পদ্ধতি বিসর্জন দিতে হয়। কারণ, সূত্র ও সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে সুন্দরের এবং সুরের পরিচয় দেওয়া যায় না।

ফাল্গুন, ১৩৫৪

কংগ্রেস আন্দোলন ও শিল্পীমনের সমস্যা

সাধারণভাবে অসহযোগ আন্দোলনের কাল থেকেই ভারতে গণ-আন্দোলনের সূত্রপাত বলে বলা হয়ে থাকে। এই সময় থেকেই দেশের রাজনৈতিক পটভূমি বিস্তৃততর হয়, এবং সাধারণ মানুষের চেতনাতেও মোটামুটিভাবে রাজনৈতিক তরঙ্গের একটা ধাক্কা লাগে। কিন্তু তা সত্ত্বেও শিল্প-সাহিত্য এই আন্দোলনের বা তৎপরবর্তী আন্দোলনের (এখানে ১৯২০-১ সাল থেকে ১৯৪২ এর সংগ্রামের পূর্বেকার আমলের কথাই বলা হচ্ছে) পরিচয় বিশেষ নেই; পণ্ডিত সমাজ এ সম্পর্কে একমত। দেশের সুদূরতম প্রান্তেও একটা নব জাগরণ অনুভূত হয়েছে; অথচ শিল্প-সাহিত্যে তার স্বাক্ষর নেই, মননধর্মী সৃষ্টিশীল চিন্তা তাতে সাড়া দেয়নি, এ অবস্থাটা মনে হয় যেন স্ববিরোধী। অথচ বাস্তবিক তাই হয়েছে। কি ক'রে, কেন এরকমটা ঘটলো তার একটা হিসেব নিকেশ নেওয়া বর্তমান সময়ে বিশেষ অনুচিত হবে না। কারণ, গভীরভাবে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, জাগরণ আছে অথচ প্রাণের স্পন্দন নেই—এমনি একটা বিপর্যয় আজকের শিল্প-সাহিত্যেও প্রকট। আলোচনান্তে এর স্ববিরোধ সম্পর্কে সচেতন হওয়া যাবে বলে আমার বিশ্বাস।

বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে কংগ্রেস আন্দোলন অর্থাৎ ভারতের জাতীয়

আন্দোলন আর দেশের জাতীয় আন্দোলনের মতই আদর্শ, লক্ষ্য এবং নেতৃত্বের দিক দিয়ে ছিল বুর্জোয়া আন্দোলন। দেশীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থকে কেন্দ্র করেই জাতীয় আন্দোলনের গতি আবর্তিত হয়েছে। কিন্তু ভারতেব জাতীয় আন্দোলনের খানিকটা বৈশিষ্ট্য অনস্বীকার্য। কারণ, তার পুরোভাগে ছিলেন এমন এক ব্যক্তি, যাঁর সর্ববিধ আচরণকে নিছক বুর্জোয়া শ্রেণীস্বার্থের মাপকাঠি দিয়ে সর্বদা বিচার করা যায় না। বুর্জোয়া শ্রেণীস্বার্থের গণ্ডী অতিক্রম না করেও তাঁর নির্বিশেষ মাপকাঠি মানবধর্মবাদই জাতীয় আন্দোলনকে একান্ত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। অবশ্য, এই মানবধর্মবাদ কংগ্রেসের দৈনন্দিন রাজনীতিতে পরিব্যাপ্ত ছিল সে কথা বল্‌লে অত্যুক্তি হবে। কিন্তু গান্ধীবাদে মানবধর্মবাদ ছাড়া অন্যান্য দিকও ছিল যার ব্যবহারিক প্রভাব কংগ্রেস আন্দোলনে অনস্বীকার্য। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেস একটা আধার মাত্র ; তার অন্তরের সত্তা হ'লো সেই গান্ধীবাদ। মতবাদ হিসাবে গান্ধী-বাদ ভারতের জাতীয় অন্দোলনের প্রথম দিকেই পরিপূর্ণ রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেনি। আন্দোলনের বিকাশ ধারার সঙ্গে সঙ্গেই গান্ধীবাদও তার আদর্শ, বোধ, লক্ষ্য ও প্রয়োগবিন্যাসের পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়েছে। সে কথা এখানে আলোচ্য নয়। তবে গান্ধীজীর মতবাদই যে কংগ্রেস আন্দোলনের প্রেরণা, জনসাধারণের নিকট কংগ্রেসের প্রকৃত পরিচয়, সে কথা স্বীকার করে নিয়ে ঐ আন্দোলনের লক্ষণগুলি বিচার করা যাক।

প্রথমেই উল্লেখযোগ্য যে, জাতীয় আন্দোলনে কি হতে পারত কিম্বা কি করা যেতে পারত, তা নিয়ে বিতর্ক আজ নিরর্থক ; কি হয়েছে তার আলোচনা ও তাৎপর্য বিশ্লেষণই আজকের সমস্যা। ১৯২০ সালের

অসহযোগ প্রস্তাবে খিলাফৎ এবং পাঞ্জাবের ঘটনাবলী সম্পর্কে সরকারী মনোভাবের নিন্দা করে বলা হয় যে এ দু'টো অন্যায়ের প্রতিকার না হ'লে ভারতে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরে আসবে না; এবং জাতির আত্মমর্য্যাদা স্থাপন ও ভবিষ্যতে অনুরূপ অন্যায়ের পুনরাবৃত্তি অসম্ভব করার একমাত্র কার্যকরী পন্থা হ'লো স্বরাজ প্রতিষ্ঠা। স্ববাজেব অর্থ আজ অবশ্য স্পষ্ট, কিন্তু তখন তা ছিল না। পণ্ডিত জওহরলাল তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন, স্ববাজের সংজ্ঞায় গান্ধীজী ছিলেন "delightfully vague"। এই অস্পষ্টতার আবরণে আবৃত স্ববাজ প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত অসহযোগ নীতি গ্রহণ ও পালন করার সিদ্ধান্ত কবা হয়। কি করতে হবে তার নির্দেশক রূপে বলা হয়, উপাধি বর্জন, অবৈতনিক ও স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠানের সদস্যপদ ত্যাগ, সরকারী দববার এবং সবকারী ও আধাসবকারী অনুষ্ঠান, আদালত বর্জন, সরকারী স্কুল কলেজ বর্জন ও জাতীয় স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা, বিদেশী দ্রব্য বর্জন, পরিষদ নির্বাচন বর্জন এবং নিষেধাজ্ঞাভঙ্গকারী প্রার্থীদেব ভোটদানে বিরত থাকা, ইত্যাদি। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, কার্যসূচীটি সম্পূর্ণ নেতিবাচক। কি প্রতিষ্ঠা করতে হবে বা কি আপনা আপনি প্রতিষ্ঠিত হবে, তা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, কিন্তু সেই অজ্ঞাত জিনিসটির আশায় কতকগুলি নেতিধর্মী বর্জনমূলক কার্যসূচী অনুসরণ করার নির্দেশ দান করা হলো। জাতীয় স্কুল কলেজ ও সালিশী আদালত প্রতিষ্ঠা, চরকা গ্রহণ ইত্যাদির কথা অবশ্য উল্লিখিত হয়েছে, কিন্তু তা কার্যকরী করার প্রতি বিশেষ মনোযোগ আকৃষ্ট হয়নি। আর হ'লেও বা কী, তা নিয়েই তো স্বরাজ হ'তো না। অর্থাৎ সৃষ্টির কথা নেই, যে কর্মের মাধ্যমে হবে জাতীয় জীবন, আশা-আকাঙ্খা ও জীবনবোধের নব রূপায়ণ, তার ডাক নেই, যে

বস্তু প্রতিষ্ঠিত হবে তা অনির্দিষ্ট, অগোচর। আছে, শুধু যাকে সৃষ্টিছাড়া অকল্যাণ বলে বোধ হচ্ছে সেই প্রত্যক্ষকে বর্জন করার আগ্রহ ও কর্মোদ্যম। এই সঙ্কল্পের সাথে সম্পূর্ণ একমত না হয়ে দেশবন্ধু, পণ্ডিত মতিলাল প্রভৃতি যে স্বরাজ্য দল গড়ে তুলেছিলেন, তারও প্রধান প্রেরণা ছিল পরিষদ কক্ষে সরকারের সর্ববিধ কার্যে বাধা সৃষ্টি করা। অবশ্য তাঁরা জাতীয় স্বার্থানুকূল্যে কয়েকটি প্রস্তাব পাশ করিয়ে ছিলেন, কিন্তু তা-ও গান্ধীজীর অনুরোধে। এখানেও উদ্দেশ্যটা নেতিমূলক। তারপর, ১৯২৯ সালে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হলেও বাস্তব রাষ্ট্রীয় গড়ন ও ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সম্পর্কিত সমস্যা গভীরতর মর্যাদা পায়নি বলেই ১৯৩০ সালের আন্দোলনেও আইন অমান্য, করদান বন্ধ ইত্যাদি নেতিধর্মী মানসপ্রকরণের মধ্য দিয়েই প্রবাহিত হয়েছে। ক্রমে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জনসাধারণের মৌলিক অধিকার ইত্যাদি ঘোষিত হয়েছে, ভাবী রাষ্ট্রকাঠামো সম্পর্কে অস্পষ্ট ঘোষণা প্রচারিত হয়েছে, গান্ধীজীর মতবাদও আরও বেশী সুস্পষ্ট, পূর্ণতরভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে, সেই সব আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বহুকর্মী গঠনকর্মে আত্মনিয়োগ করেছেন, এবং দ্বিতীয় বিশ্বসমরের গোড়ার দিকে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহরূপ আন্দোলনও হয়ে গিয়েছে, কিন্তু পূর্বেকার আন্দোলনের যে ধারা, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ অকল্যাণকে শুধুই অস্বীকার, শুধু বর্জনরূপ যে ঐতিহ্য তা-ই এই সমগ্র যুগের বিভিন্ন পর্যায়ের বিভিন্ন কার্যক্রমকে প্রাণ দিয়েছে, নিয়ন্ত্রিত করেছে। কিন্তু জাতীয় সিদ্ধিলাভের পক্ষে এই কার্যক্রম যে অসম্পূর্ণ, তা যে অখণ্ড জাতীয় মানসের পরিচায়ক নয়, সে কথা মানতেই হবে। নেতিধর্মী কার্য অবশ্য উপেক্ষনীয় নয়, কিন্তু তা আমাদের ব্যাপক কার্যক্রমের, সর্বাত্মক জীবন সাধনার একটা দিক

মাত্র। যে কর্ম দ্বারা প্রত্যক্ষ অকল্যাণকে দূর করে কল্যাণময় সামাজিক রাষ্ট্রিক বোধের প্রতিষ্ঠা সম্ভব, সেই কর্মের অর্থাৎ বিপ্লবের রূপটি দ্বৈত; হাঁ অর্থাৎ সৃষ্টি, এবং না অর্থাৎ ধ্বংসের রূপ নিয়েই তার পরিপূর্ণতা। প্রথমটি লক্ষ, দ্বিতীয়টি উপায়। কোনটাই এককভাবে প্রাধান্য পেতে পারে না। পেলে বিপ্লবের কার্যহানি হয়। কিন্তু সমগ্র কংগ্রেস আন্দোলনে উপায়টা লক্ষকে ছাপিয়ে, বর্জন অর্থাৎ ধ্বংসটা সৃষ্টি প্রেরণাকে ছাপিয়ে, উপেক্ষা করে একটা দিক থেকে অস্বাভাবিক ও বিপ্লবের পক্ষে হানিকর প্রাধান্য ও বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। তাতে হয়েছে কি, আমরা ডাক পেয়েছি মাত্র আমাদের বাইরের কোঠায়, অন্তরের অন্দরমহলে নয়। বিশেষ কয়েকটি বাহ্য আচারণ পদ্ধতির প্রতি আনুগত্য এবং নিজ ব্যবহারের সঙ্গতি স্থাপনের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু তাতে গভীরতর সৃষ্টি-প্রেরণার উদ্বোধন ঘটেনি।

গান্ধীজী একাধিক বার স্বরাজ লাভের নির্দিষ্ট সন তারিখ ঘোষণা করেছিলেন। ঐ তারিখের বা সময়ের মধ্য স্বরাজলাভ সম্ভবপর ছিল না বলেই কি তখনআমরা স্বরাজ পাইনি, নাগান্ধীজী দেশবাসীর কাছ থেকে যেরূপ আচরণ আশা করেছিলেন তা পাননি বলেই আমাদের আশা বিফল হয়েছিল, সে প্রশ্ন উত্থাপন আজ নিষ্প্রয়োজন। তবে, ঐরূপ ঘোষণার সাহায্যে আমাদের মনকে প্রভাবিত করার যে তাৎপর্য তা এখানে আলোচনার যোগ্য। প্রথমেই এই প্রশ্ন করা যেতে পারে, ঐরূপ ঘোষণার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে কে জবরদস্তি করেছিল? বিশ্বাস তো না-ও করা যেতে পারতো। কথাটা সত্য, আর বাস্তব-বুদ্ধি-প্রখর হিসাবী মন সম্ভবত তাতে বিশ্বাস স্থাপনও করেনি। কিন্তু নেতাকে অনুসরণ করার দায়িত্ব জনসাধারণের, আর নেতার দায়িত্ব

জনসাধারণকে পরিচালিত করা। সুতরাং নেতৃত্ব যাতে সুস্থ যুক্তিবহ সিদ্ধান্তের উপর, বুদ্ধির সত্যের উপর, কার্যসূচীর কার্যকারিতার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তার প্রতি নেতার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকা চাই; দেখা চাই, যাতে দেশের সমস্ত সুপ্ত শক্তি বিচিত্রভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠার কাজে জেগে ওঠে। যদি বলি, দেশটা অত্যন্ত বিশ্বাসপ্রবণ, দুর্মর সংস্কারে দেশের মন মুহ্যমান, এদেশের লোকের elemental passions জাগাতে না পারলে কর্মক্ষেত্রে কোন কালেই তাদের নামান যাবে না তথাপি এ প্রশ্ন থেকেই যায়, গান্ধীজীর মত সত্যাশ্রয়ী মানুষ, আর্থিক পারমার্থিক সর্বাঙ্গীণ কল্যাণে বিশ্বাসী নেতা কি করে এতো সস্তা ডাক দিতে, এতো সহজ কৌশল অবলম্বন করতে পারলেন? Elemental passions জাগানোর জন্যে বিচারবুদ্ধি বিসর্জন-দেওয়া বাধ্যতা কি করে আহ্বান করতে পারলেন? চিন্তাশীল এবং মননধর্মী মানসের উপর তার প্রতিক্রিয়া কি হ'বে, তা বিচাব করার অবকাশ হয়তো গরজের আবেগে সম্ভব হয়নি। কিন্তু তৎকালেই রবীন্দ্রনাথেব চোখে এর সুদূরপ্রসারী ফল ধরা পড়েছিল। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: "মহাত্মাজীর কণ্ঠে বিধাতা ডাকবার শক্তি দিয়েছেন,...কিন্তু তিনি ডাক দিলেন একটিমাত্র সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে। তিনি বল্লেন—কেবলমাত্র সকলে মিলে সুতো কাটো, কাপড় বুনো। এই ডাক কি সেই "আয়ন্তু সর্ব্বতঃ স্বাহা!" এই ডাক কি নবযুগের মহাসৃষ্টির ডাক? বিশ্বপ্রকৃতি যখন মৌমাছিকে মৌচাকের সঙ্কীর্ণ জীবন যাত্রায় ডাক দিলেন তখন লক্ষ লক্ষ মৌমাছি সেই আহ্বানে কর্ম্মের সুবিধার জন্য নিজেকে ক্লীব করে দিলে; আপনাকে খর্ব্ব করার দ্বারা এই যে তাদের আত্মত্যাগ এতে তারা মুক্তির উল্টো পথে গেল।...চরকা কাটা একদিকে অত্যন্ত

সহজ, সেই জন্যেই সকল মানুষের পক্ষে তা শক্ত। সহজের ডাক মানুষের নয়, সহজের ডাক মৌমাছির। মানুষের কাছে চূড়ান্ত শক্তির দাবি করলে তবেই সে আত্ম প্রকাশের ঐশ্বর্য্য উদ্‌ঘাটিত করতে পারে। স্পার্টা বিশেষ লক্ষের দিকে তাকিয়ে মানুষের শক্তিকে সঙ্কীর্ণ করে তাকে বল দেবার চেষ্টা করেছিল, স্পার্টার জয় হয়নি ; এথেন্স্ মানুষের সকল শক্তিকে উন্মুক্ত করে তাকে পূর্ণতা দিতে চেয়েছিল, এথেন্সের জয় হয়েছে ; তার সেই জয় পতাকা আজও মানব-সভ্যতার শিখর-চূড়ায় উড়ছে। ··বড়ো কলের দ্বারাও মানুষকে ছোটো করা যায়, ছোটো কলের দ্বারাও করা যায়। চরকা যেখানে স্বাভাবিক সেখানে সে কোন উপদ্রব করে না, বরঞ্চ উপকার করে—মানবমনের বৈচিত্র্যবশতই চরকা যেখানে স্বাভাবিক নয় সেখানে চরকায় সুতা কাটার চেয়ে মন কাটা যায় অনেকখানি। মন জিনিষটা সুতার চেয়ে কম মূল্যবান নয়।" (কালান্তর, পৃঃ ১৭১-১৭২)

বুদ্ধিজীবী মহলের কাছে তখনকার যুগে বুদ্ধিচাপা পড়ার, মন কাটা যাওয়ার ভয় ছিল। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় একটি প্রবন্ধে বলেছেন যে, গান্ধীজী প্রবর্তিত সত্যাগ্রহের সত্য ভগবান, কিন্তু আগ্রহ মানুষের ('ক্রান্তি' নবম-দশম সংখ্যা)। কিন্তু একথাও অনুরূপ সত্য যে, সমাজের বাস্তব পরিবেশ যদি মানুষের কর্মের প্রেরণা না যোগায় তাহলে মানুষের আগ্রহও দেখা দিতে পারে না। কংগ্রেস আন্দোলনের স্তরে স্তরে দেশী বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থের প্রেরণা এবং বাস্তব জীবনের দুর্বহতার কবল থেকে জনসাধারণের মুক্তির প্রেরণা ছিল সত্য কিন্তু যে মন্ত্র ঐ আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে, তাতে বাস্তব-নিরপেক্ষতার ছাপ সুস্পষ্ট। গান্ধীজীর সাধনায় উল্লিখিত হয়েছে যে মানুষ আত্মকেন্দ্রিক ত্যাগ, সংযম, কৃচ্ছ্রসাধনের বলে পারিপার্শ্বিককে

জয় করতে পারবে। পারিপার্শ্বিককে জয় করা অর্থে একে রূপান্তরিত করার কথাই আমাদের বুঝতে হবে। কিন্তু এই পারিপার্শ্বিককে রূপান্তরিত করার কাজটা সামাজিক, সুতরাং সমাজপ্রবাহের ধারা ও সূত্র আয়ত্ত করেই তাকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। কিন্তু গান্ধীজীর সাধনমার্গ এই সহজ সামাজিক সূত্রানুগ হয়নি। অর্থাৎ মানুষকে একটি সামাজিক সমস্যার সমাধান করতে বলা হলো, অথচ সমাধানের জন্য যে সাধনমার্গের বিধান দেওয়া হলো সেটা সমাজ নিরপেক্ষ, শুধুই আত্মগত, ব্যবহারিক প্রয়োগ ফল নিরপেক্ষ, বৈজ্ঞানিকের ভাষায় irrational। গান্ধীবাদের পরিণত রূপে বিকেন্দ্রীকৃত গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক যে সমাজের পরিকল্পনা করা হয়েছে, তাতে সহজে প্রত্যয়শীল মন বিনা তর্কে সায় দেয়। কেন না, শত শত বৎসরের ঐতিহ্য এর সঙ্গে জড়িত। বহু ঝড়ঝাপ্টা, রাজনৈতিক উত্থানপতনের ফলেও এর রূপটা অবিকৃত. অপরিবর্তিত রূপে বৃটিশ আমল সুরু হওয়ার আগে পর্যন্তও ছিল। রাজা বা সিংহাসন পরিবর্তনের ছাপ এই সব গোষ্ঠী-জীবনের উপর পড়েনি। সুতরাং এই যে অপরিবর্তনীয় সমাজ, যা পারিপার্শ্বিককে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা উপেক্ষা করে আপন অস্তিত্ব যুগ যুগ ধরে অচল অটুট রাখতে পারে, কল্পনায় রূপটা তার জাজ্জ্বল্যমান হয়ে ফুটে ওঠে। কিন্তু এর সহজ ঐতিহ্যকে অতিক্রম করে, এর সরল অনাড়ম্বর নির্লিপ্ত জীবনযাপনের আদর্শকে ছিন্নভিন্ন করে এই রূঢ় সত্যটাও মনকে চোখকে কল্পনাকে সর্বদা খোঁচা দেয় যে, জীবনটা তত সহজ ছিল বলেই বহিঃশত্রুর নিকট পরাভবটাও সহজ ছিল। কারণ, অতি সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে মানুষের মনটা ছিল আবদ্ধ, মানুষ কর্মপ্রেরণায় পারিপার্শ্বিকের উপর বিজয়ী না হ'য়ে ছিল পারিপার্শ্বিকের

নিকট বন্দী, মানুষের মন ছিল নিকৃষ্ট ধরণের প্রকৃতি পূজা (যেমন, হনুমানপূজা, সর্পপূজা গরুপূজা ইত্যাদি) এবং সর্বপ্রকার কুসংস্কার ও সামাজিক অনাচারের আবাসস্থল। গান্ধীজী পরিকল্পিত আদর্শ মানব নিয়ে গঠিত আদর্শ সমাজে ঐ সব অনাচার থেকে বিমুক্ত হওয়ার আশা অভিব্যক্ত হয়েছে সত্য, কিন্তু "গান্ধীবাদের মানুষ আপনার আমার পরিচিত মানুষ নয় অথচ গান্ধীযুগের শক্তিশালী মানুষ আপনার আমার জীবন নিয়ন্ত্রণ করছে" (ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়)। অর্থাৎ আন্দোলনের মন্ত্রটা ছিল irrational, বাস্তব পরিবেশকে অবাস্তবতা সম্ভূত আদর্শ দ্বারা রূপায়ণের প্রচেষ্টা। Rationality অর্থে আমরা বুঝি, সমাজে ও পারিপার্শ্বিকের মধ্যে প্রবাহের যে ধারা চলেছে, তার সূত্রগুলিকে বুঝে তার সাথে মানবক্রিয়ার সমন্বয় সাধন। কিন্তু আন্দোলনের আদর্শে তার অভাব ছিল বলেই ভাবস্বের যে পরিচয় মানুষের চোখের সামনে ভেসে উঠত, তার দীপ্তি বড় বেশী ছিল না। মন তাই স্বল্প কালের জন্য মোহাবিষ্ট হলেও তার মোহ কাটতেও বেশী সময় লাগে নি।

গান্ধীজীর জীবিত কালে এতটা বোঝা যায়নি, কিন্তু আজ তাঁর মৃত্যুর পর একথা অত্যন্ত সহজবোধ্য হয়েছে। কারণ, এত বড় একটা মানুষ যে আর আমাদের মধ্যে জীবিত নেই, এরই মধ্যে কি মানুষ সেটা বিস্মৃত হয়ে যায়নি? গান্ধীজীর মৃত্যুর দিনে যে শূন্যতাবোধ মানুষকে চঞ্চল করেছিল তা কি অল্প কয়দিনেই কেটে যায়নি? স্বীকার না করে আর উপায় নেই যে, বাস্তবকে অস্বীকার করে মুক্তির যে সাধনা, আর বাস্তবকে স্বীকার করে যে মুক্তিসাধনা এই দু'য়ের পার্থক্য প্রবল। গণমনের সাধনা বাস্তবকে স্বীকার করে'

মুক্তি অর্জন করা। অর্থাৎ সর্বকালের সাধারণ মানুষের জীবনাচরণের ভঙ্গীটা জড়বাদী। অর্থাৎ বাস্তব পৃথিবীকে স্বীকার করে, একে বর্জন না করে এর বুক থেকেই রঙ রস আহরণ করে, এরই সঙ্গে সত্য সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে গণমন সৃষ্টি করে তার জগৎ, তার জীবন। বর্জনের আদর্শ তাই তাকে আকৃষ্ট করে না। নিস্পৃহ জীবন-বেদ তার কাছে অবোধ্য। গান্ধীজীর মন্ত্রে গণমনের সত্য জীবনবোধের স্বকৃতি দুর্বল। এই সমস্ত কারণেই বলতে হয় যে, জাতীয় আন্দোলনের যে যুগ আমরা অতিক্রম করে এসেছি, তার কোন কোন স্তরে লক্ষ্য ছিল বৃটিশ শাসন, কখনও কখনও সে লক্ষ্য স্বাধত্ত শাসনের স্থলে ভগবানকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, কিন্তু দেশের জনসাধারণ কোনকালেই তার লক্ষ্য ছিল না; তারা বরাবরই উপলক্ষ্য হিসাবে পরিগণিত হয়েছে।

তা হলে অবস্থাটা এই দাঁড়ালো যে, কংগ্রেস আন্দোলনের প্রকৃতি সৃষ্টি-ধর্মী ছিল না, ছিল নেতিধর্মী। নেতিধর্মিতার ফলে, আন্দোলনের প্রবাহ যখন জনসাধারণকে প্রত্যক্ষ বাস্তব কার্যক্রম গ্রহণে সৃষ্টিধর্মী করে তোলার উপক্রম করেছে, তখনই তাতে অকস্মাৎ বাধা দেওয়া হয়েছে। এতে সমগ্র দেশের সমস্ত শক্তির উদ্বোধনের আহ্বান ছিল না, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারেই হোক, মানুষের স্বাভাবিক ক্রিয়া ও বুদ্ধির প্রক্রিয়াকে উৎসাহ দান করা হয়নি। সৃষ্টিশীল মনের দুয়ার তাই উন্মুক্ত হয় নি। পৃথিবী এসে মানুষের কর্মে মনে অনুভূতিতে সৃষ্টির সাড়া জাগায়নি। অর্থাৎ এ আন্দোলন ছিল irrationality'র উপর প্রতিষ্ঠিত, অতএব a-intellectual. সে জন্যই দেশের বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর সঙ্গে এই আন্দোলনের যোগাযোগ খুব গভীর ছিল না, তারা হয় পথ ছেড়ে

দাঁড়িয়েছে, নয় দূরে সরে গিয়েছে। আর এর আদর্শের সাথে ছিল লৌকিক আদর্শের বিরাট ব্যবধান। স্বাভাবিক সারল্য ও বিশ্বাস প্রবণতা-বশে সাধারণ মানুষ যেমন সহজে তাতে সায় দিয়েছে, তেমনি বাস্তব ক্ষেত্রে সেই আদর্শ অনুসরণের কাজে তত ব্যর্থ ও অকৃতকার্য হয়েছে।

তাই কংগ্রেস আন্দোলনের এই অসম্পূর্ণতা সৃষ্টিধর্মী মনকে উদ্বেল করতে পারে নি। শিল্পসাহিত্যের কাজ কখনও নেতিধর্মী হতে পারে না,—তা সৃজনশীল। এই সৃষ্টির কাজে আত্মনিয়োগ করতে হলে তার আগে শিল্পীমনের স্ফুরণ হওয়া চাই, আর শিল্পকাযে উদ্বোধিত মন হাওয়ায় পাখা তুলে উড়তে চায়। কারণ, এতেই শিল্পীমনের প্রতিষ্ঠা, তার সাফল্য। নিজেকে চরম ভাবে জানাতে, উপলব্ধি করাতে, নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করাতে, নিজের মনের সঙ্গে তার পরিবেশের অন্বয় সাধন করতে পারলেই শিল্পকার্যের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়। কিন্তু কংগ্রেস আন্দোলনে সে প্রেরণা ছিল না। তাই, সৃজনশীল মনের সঙ্গে এই আন্দোলনের স্ববিরোধ প্রত্যক্ষ।

শিল্পীর কাজকে আমরা জানি নৈর্ব্যক্তিকরূপে। এই নৈর্ব্যক্তিকতা অর্জন করতে হলে তাকে তার অহং বিসর্জন দিতে হয় এবং শিল্পীর মানস প্রকরণের ক্রমপরিণতিতে তার অহং-এর বিনাশ ঘটে। এটাই কবি মনের সহজ পরিণতি ;—কারণ, এই নৈর্ব্যক্তিক ভাবভঙ্গীর মধ্যেই শিল্পী অযুত মনের সঙ্গে নিজের মনকে সংযুক্ত করে, আর সকলের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত দেখতে পায়। কিন্তু এই আত্মবিসর্জন কার কাছে ? কার কাছে কখন এই আত্মনিবেদন ঘটতে পারে ? যা শিল্পীর নিজের অহং অপেক্ষা বৃহৎ মূল্যবান যা অধিকতর ব্যাপক, বিস্তৃত ও সীমাহীন তার কাছেই এই আত্মবিসর্জন ঘটতে পারে,—

এই বিসর্জনের পথেই তার সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের কথায় "আত্মা পুত্র-স্নেহের মধ্যে সৃষ্টিকর্তারূপে আপনাকে প্রকাশ করতে চায়। তাই পুত্রস্নেহ তার কাছে মূল্যবান। সৃষ্টিকর্তা যে তাকে সৃষ্টির উপকরণ কিছু বা ইতিহাস যোগায় কিছু বা তার সামাজিক পরিবেষ্টন যোগায় কিন্তু এই উপকরণ তাকে তৈরী করে না। এই উপকরণগুলি ব্যবহারের দ্বারা সে আপনাকে স্রষ্টারূপে প্রকাশ করে...হাল ধরে আছে আমার সৃষ্টির তরীতে সেই আত্মা যার নিজের প্রকাশের জন্য পুত্রের স্নেহের প্রয়োজন, জগতের নানা দৃশ্য নানা সুখ দুঃখকে যে আত্মসাৎ করে বিচিত্র রচনার মধ্যে আনন্দ পায় ও আনন্দ বিতরণ করে।" কিন্তু কোন স্রষ্টা কংগ্রেস আন্দোলনের মধ্যে নিজেকে অভিব্যক্ত দেখতে পায় নি, এ আন্দোলনকে নিজ প্রকাশের অনুকূল বলে গ্রহণ করতে পারে নি, এর মধ্যে অহং বিনাশকারী বিরাটের সন্ধান পায়নি, তাই এর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়তো বা ছিলেন তারা কুণ্ঠিত। অর্থাৎ, শিল্পীর অহংকে দুর্বার আকর্ষণে টেনে বার করে ছিন্নভিন্ন করে তার আত্মনিবেদন দাবী করার ক্ষমতা ছিল না কংগ্রেসী আন্দোলনের। অবশ্য এখানে প্রতিবাদের আশঙ্কা রয়েছে। ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন দৃষ্টান্ত তুলে হয়ত একথা প্রমাণ করার চেষ্টা করা যেতে পারে যে সৃষ্টিধর্মী মন তাতে সায় দিয়েছিল এবং সৃষ্টির প্রেরণাও পেয়েছিল। কিন্তু সে প্রেরণা কতখানি ক্ষীণ, কতখানি হালকা ছিল তা অন্য উদাহরণের কথা বাদ দিলেও সত্যেন দত্তের চরকার উপর লেখা গানেই অভিব্যক্ত। কোন অতি উৎসাহী ব্যক্তিও সত্যেন দত্তের এ গানকে কাব্যের বা শিল্পসৃষ্টির মর্যাদা দান করতে সাহসী হবেন না নিশ্চয়।

এখানে আরও উল্লেখযোগ্য যে, সৃজনধর্মী মনের সঙ্গে লৌকিক

মনের একটা সহজ সম-ধর্মিতা আছে। আগেই উল্লেখ করেছি যে, লৌকিক মনের সাধনা বাস্তবকে অস্বীকার করে নয়, বাস্তবকে স্বীকার করে। কার্যকরীভাবে বাস্তবকে রূপান্তরিত করে রূপরসস্বাদগন্ধময় পৃথিবীতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করাই লৌকিক মনের সাধনা। সৃজনধর্মী মনের সঙ্গেও বাস্তবের যোগাযোগ অনুরূপ ঘনিষ্ঠ। শিল্পীকে প্রচলিত অর্থে আমরা বাস্তববাদীই বলি আর রোমান্টিকই বলি, শিল্পীর যে ভাবসত্তা তা তার একক বা নিজস্ব নয়। প্রাত্যহিক কর্মের যোগসূত্রে আবদ্ধ বহু মানুষের অনুভূতির জগতে তা সত্য বলে স্বীকৃত বলেই তার বৈশিষ্ট্য। শিল্পীর অনুভূতির মধ্যে সামাজিক মানুষ যদি তার অনুভূতির প্রকাশ দেখতে না পেত, তাহ'লে রস বলে কোন পদার্থ কোন কালেই স্বীকৃত হ'তো না। এদিক থেকে শিল্পীর অনুভূতি ও তার প্রকাশ-রূপের একটা বাস্তব পরিচয় আছে। কংগ্রেস আন্দোলনের যে অংশটা আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু, তার আদর্শ ও কার্যক্রম এমনি যে পরিচিত বাস্তব পৃথিবীতে তার প্রতিষ্ঠা নেই, আর তার ভাবরূপকেও সামাজিক মানসের পটভূমিতে বিস্তৃত করে উপলব্ধি করার উপায় নেই। সুতরাং আন্দোলনে নেমে জনসাধারণের পক্ষেও গান্ধীজী অঙ্কিত সীমারেখার প্রতি শ্রদ্ধাবান থাকা সম্ভব হয়নি, আর সৃজন-শীল মানসও এর সঙ্গে নিজের ঐক্য অনুভব করতে পারে নি। এ কথাটার আরও প্রমাণ পাই যখন দেখি যে, ১৯৪২এর আগষ্ট সংগ্রামে, পূর্বেকার কংগ্রেস আন্দোলনের কোন নিয়ম-কানুন ও আদর্শ পালন করা হয় নি, এবং যে সংগ্রামে জনতা আপন সিদ্ধির জন্য প্রত্যক্ষ বাস্তবকে আপন নিয়মানুসারেই রূপান্তরিত করার জন্য অগ্রসর হয়েছিল, সেই সংগ্রাম

সৃষ্টিধর্মী মনকে উদ্বোধিত করেছিল বিচিত্রভাবে এবং তার স্বাক্ষরও শিল্পসাহিত্যে প্রচুর। পূর্বেকার কংগ্রেস আন্দোলনের সঙ্গে বিয়াল্লিশের সংগ্রামের পার্থক্য সুস্পষ্ট; এখানে পূর্বেকার মত শুধু বর্জন করার, বৃটিশ কুশাসনকে শুধু অস্বীকার করার চেয়ে প্রত্যক্ষ অকল্যাণকে দূর করে নিজেকে সৃষ্টি করার প্রেরণাই ছিল বড় কথা, আর এই যে সৃষ্টিরূপ, এর যে ভাবরূপ, তাকে বহু মানুষের সংযোগে ভোগ করা চলে, উপলব্ধি করা চলে। তাই একে অবলম্বন করে রসের সৃষ্টি স্বাভাবিক, এবং মানুষের intelligent will এর কাছে এর আবেদনও প্রত্যক্ষ। কারণ, Reality is created by the inexhaustible and intelligent will of man and its development will never be arrested" (Gorky)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে কেউ যদি মনে করেন যে, জাতীয় আন্দোলনের কোন প্রভাবই সৃজনধর্মী মনের উপর পড়েনি, তাহ'লে ভুল করা হবে। বাস্তব রাজনৈতিক আবহাওয়ার সাধারণ নির্বিশেষ একটা প্রভাব থাকে, যা প্রত্যেক মানুষকেই প্রভাবিত করে এবং সৃজনধর্মী মনও তা থেকে বিমুক্ত থাকে না। আমাদের দেশে সে আবহাওয়ার প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল বিদেশী শাসনের কবল থেকে মুক্তিলাভের প্রেরণা; এই প্রেরণা শিল্পীমনে রাজনৈতিক মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে প্রচলিত রীতিনীতি, শিল্পাদর্শ ও ভঙ্গীর অনুশাসনের কবল থেকেও মুক্তির প্রেরণা সঞ্চারিত করেছিল, জাতীয় জীবনের বিভিন্ন দিকে তার ছাপ সুস্পষ্ট। শিল্প, সাহিত্য, অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক চিন্তা, দার্শনিক সূত্রানুসন্ধান, সমাজ সংস্কার ইত্যাদি সমস্ত কর্মেই আমাদের মন প্রবুদ্ধ হয়েছিল। আমার বক্তব্য

এই নির্বিশেষ রাজনৈতিক আবহাওয়ার প্রভাব নিয়ে নয়। আমি অসহযোগ আন্দোলন থেকে বিয়াল্লিশের সংগ্রামের পূর্ব পর্যন্ত বিশেষ কংগ্রেস আন্দোলনগুলির রূপ, প্রকৃতি ও প্রতিক্রিয়ার সম্পর্কেই আলোচনা করেছি এবং কিভাবে তা সৃজনধর্মী জীবনাচরণকে উজ্জীবিত করতে ব্যর্থ হয়েছে, তা নির্দেশ করার চেষ্টা করেছি।

যে যে কারণে আমি কংগ্রেস আন্দোলন সৃজনশীল মনে তরঙ্গ তুলতে পারেনি বলে অভিহিত করেছি, অল্প মাত্রায় হলেও তার কোন কোন দিক আধুনিক বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনেও উপস্থিত। বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলন প্রচুর সাহিত্য সৃষ্টি করেছে। কিন্তু আজকাল বহু লোককেই এই আক্ষেপ করতে দেখা যায় যে, ঐ সাহিত্যের আবেদন অতলস্পর্শী নয়, তা মনের গভীরে রেখাপাত করে না। বহুলাংশে এ অভিযোগ সত্য। এর কারণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সাম্যবাদী ভাবধারায় পুষ্ট ব্যক্তিদের মধ্য বর্তমান সমাজকে, সামাজিক বিধানকে অস্বীকার করার প্রেরণা যত বেশী, নিজকে সৃষ্টি করার প্রেরণা ততটা নেই; আর কোন কোন ক্ষেত্রে গোর্কিকথিত "intelligent will" এর স্বাভাবিক অভিব্যক্তিকে প্রতিহত করার তাগিদও আছে। নিজেকে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর নিয়ামক রূপে এবং ভবিষ্যৎ সমাজের স্রষ্টারূপে প্রতিষ্ঠিত করতে হ'লে সহজ প্রত্যয়— অর্থাৎ ইতিহাস আমার পশ্চাতে সুতরাং আমার জয় অবশ্যম্ভাবী, এমন ধরণের মনোবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হওয়ার বিপদ অনেক। কারণ, এ সৃষ্টি করেনা, বড় জোর তা আলাদিনের বাতির প্রতীক্ষায় বসে থাকে। আর এমনি যখন অবস্থা ঘটে, তখন নিজের অক্ষমতার নিকট নিজের দাসত্বই ঘোষণা করা হয়। তখন বিচারে ক্ষমতা থাকে

না, বুদ্ধি চাপা পড়ে, হৃদয়াবেগের নিকট আবেদনটা প্রবল হয়। অবশ্য গলার আওয়াজটা ক্ষীণ হয় না। এই মনোবৃত্তি যে নিজেকে সৃষ্টি করার, আত্মশক্তিকে উপলব্ধি করার মনোবৃত্তি নয়, সে কথা বলাই বাহুল্য। যাক সে কথার বিস্তৃত আলোচনার স্থান এখানে নয়। তবে এমনি ধরণের একটা সমস্যা যে দেশ বিদেশের সাম্যবাদীদের সম্মুখে দেখা দিয়েছে সে কথাও অনস্বীকার্য। সৃজনধর্মী মন এ সমস্যার সমাধান কিভাবে করবে তা ভাববার বস্তু।

আশ্বিন, ১৩৫৫

দু'জন বিদেশী শিল্পী

মানবধর্মী নাট্যকার ঃ ইউজেন ও'নীল

মার্কিন নাট্য-সাহিত্যে ইউজেন ও'নীলের আবির্ভাব নিশ্চয়ই ঐতিহ্য-ধারাবাহী হয়ে দেখা দেয়নি। ও'নীলের আগে মার্কিন নাট্যশালা কর্তৃপক্ষের মনে পরিবেশনের উপযোগী নাটকের জন্য ভাবনার অন্ত ছিল না। 'মার্কিন' নাট্য-সাহিত্য বল্‌তে যা বোঝা যায় তার কোনো উল্লেখযোগ্য অস্তিত্বও তখন ছিল না। সমসাময়িক যে সব নাট্যকারদের নাটক তখন অভিনীত হোত তাঁদের নাট্যকলায় পৌরাণিক এবং ক্লাসিক নাটকের পুনরুজ্জীবন প্রচেষ্টার আগ্রহ ও উৎসাহের প্রাচুর্য ছিল যতটা, নাট্য-সাহিত্যে জীবনসঞ্চারের সার্থক কলাকৌশলের অভাব ছিল ঠিক ততটাই। ইংরেজী বা য়ুরোপীয় নাটকের অনুবাদ বাদ দিলে দর্শকের নয়ন মন-শ্রবণের পরিতৃপ্তি বিধান তখনকার দিনে অসম্ভব ছিল বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। রাজনৈতিক পরিভাষায় যাকে বলে অচলাবস্থা, মার্কিন নাট্যসাহিত্য এবং রঙ্গমঞ্চের তেমনি এক সঙ্কটের ভেতর মঞ্চশালা কর্তৃপক্ষের সমস্ত শঙ্কা দূর করে, বোধহয় তাঁদেরকে বিস্মিত এবং কতকটা অভিভূত করেও, ইউজেন ও'নীলের আবির্ভাব ঘট্‌লো। ও'নীল-প্রতিভা সম্পর্কে এটুকু বল্লেই যথেষ্ট হবে, শ্রোতা এবং পাঠক বা দর্শকের কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায় করে নেবার জন্যে তাঁকে সংগ্রাম করতে হয়নি—দুর্বার শক্তির জোরে ও'নীল স্বতোস্ফূর্তভাবে সে স্বীকৃতি পেয়ে

এসেছেন প্রথম থেকেই। ও'নীলের শিল্পদর্শন বা জীবনদর্শন সম্পর্কে আমাদের যার যে ধারণাই থাক্ না কেন, তাঁর নাটক যে অন্ততঃ সার্থক শক্তিধর নাটক সে সম্পর্কে কোন সংশয়ের অবকাশ নেই। মার্কিন নাট্যশালার সূত্রধারবা সেদিন আব কিছু না হোক, তাঁদেব ব্যবসার দিক দিয়ে এ ভেবেও নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিলেন, 'ব্রডওয়ে'-প্রেক্ষাগারগুলিব পাদপীঠ-আলোকেব সামনে এই শক্তিমান স্রষ্টাব রচনা নাট্যশিল্পে নূতন প্রাণবন্ত যুগের পত্তন কবতে পারবে।

এ ১৯১৬ সালেব কথা। তাবপব তিনবার পুলিটজাব পুবস্কাব ও ১৯৩৬ সালে নোবেল পুরস্কার পাওয়া ইউজেন ও'নীল আজ বিশ্ব-সাহিত্যের দিকপালদেব অন্যতম। ও'নীলকে নিয়ে মার্কিন ও ইংবেজ নাট্যসমালোচক মহলে পবিমিতিহীন বাদপ্রতিবাদ এবং বাগাড়ম্বর স্বাভাবিক ভাবেই হয়েছে। মার্কিন মহল থেকে তাঁকে জীবিত নাট্যকাবদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত কবা হয়েছে এবং ইংবেজ মহল থেকে এব প্রতিবাদে তাঁর মধ্যে 'an air of juvenility' আবিষ্কৃত হয়েছে। এই বাদানুবাদে তিক্ততা যে একেবাবে অনুপ্রবেশ করেনি তা নয়; আব তিক্ততার আস্বাদনে খাঁটি ও'নীল রসেব গুণবিচাব উপেক্ষিত হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। ও'নীল-নাট্যপৃথিবীর অধিবাসীরা অপাতদৃষ্টিতে মানসিক বিকারগ্রস্ত; এই পৃথিবীর আকাশেব নীল বং নিরাশা ও দুরাশা, আত্মবিকলন, পবাজয় ও আত্মগ্লানির কালো মেঘে আচ্ছন্ন; দিনের স্বচ্ছ আলো সেখানে অপরিচিত; কুয়াশার ক্লান্ত রূপই স্বাভাবিক সত্য। এখানকার পথেঘাটে যাদের নিত্য যাতায়াত ও বসবাস, তারা কালহারী কর্মপ্রেরণাক্ষয়ী বিবশ সংলাপের মোহে আবিষ্ট, প্রায় ঘৃণায় ও বঞ্চনা-প্রবণতায় মন তাদের কুৎসিত।

শেক্সপীয়র-সাহিত্যে আমরা যে স্বাভাবিক গৌরবোজ্জ্বল মানবমনের পরিচয় পাই, এখানে তার তুলনা পাওয়া দুষ্কর। এখানে এক অদৃশ্য দুর্নিবার শক্তির স্বপ্রকাশ চলেছে এমন এক দুর্জয় গতিতে, যার কাছে আর সব কিছুই তুচ্ছ, নগণ্য। ও'নীলের এই পৃথিবীকে লক্ষ্য করেই 'টাইম্‌স লিটেরারী সাপলিমেণ্ট'-এর সমালোচক বলেছিলেন "Mr. O'neill, indeed, has a perverse and sadistic desire to the nobility other men have seen" কিন্তু এটা হলো আপাতদৃষ্টি ; আপাতদৃষ্টিটাই পরিশেষ-দৃষ্টি কি না সে বিচারের অবকাশ নিশ্চয়ই আছে।

বিরোধের মধ্য দিয়ে, দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে সত্যের সঙ্গে পরিচয়, দুঃখের মধ্য দিয়ে আনন্দের সাক্ষাৎ, মৃত্যু পার হয়ে অমৃতের সন্ধান—ভারতীয় দর্শন ও এস্‌থেটিক্‌সের এ হলো মূল কথা। এতে ভাববাদের যে প্রস্তাব আছে, তা থেকে একে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে বলা যায় যে, বিরোধ-দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই প্রত্যেক শিল্পসৃষ্টির অভিব্যক্তি। যাকে শিল্পীর কলা-কৌশলে রূপদান করতে হবে, তার অস্তিত্ব শিল্পীর মনের বাইরে। বাইরের এই বস্তু-সত্যকে তাঁর অন্তরের সমস্ত অনুভূতি, সমস্ত সমবেদনা দিয়ে সঞ্জীবিত করে প্রকাশ করতে হবে। অতএব শিল্পীর মনের সঙ্গে বাইরের বস্তু সত্যের সংঘাত নিয়তই চলছে। অবশ্য শিল্পীতে শিল্পীতে তার প্রকাশ ভঙ্গীর রকমফের নিশ্চয়ই হবে। কেউ হয়তো প্রতীকী ভাষায় কেউ ছাঁটাই বাছাই করে প্রকৃত সার কথাটি বাস্তব ভাষায়, কেউ ছাঁটাই বাছাই না করেই যেমনটি আছে তেমনটিকেই সাধারণ কথা বলা ভাষায় অভিব্যক্ত করেন। কিন্তু বস্তু-সত্য আর প্রকাশমান সত্যের মাঝখানে ব্যবধান আছে বলেই ভাষায় অভিব্যক্ত রূপের সঙ্গে বাস্তব

রূপের হুবহু মিল নেই ; যেমন মিল নেই পাঠকের আস্বাদিত চিত্ররূপেব সঙ্গে শিল্পীব মনেব আসল চিত্ররূপেব। কারণ, রসাস্বাদনে প্রত্যেক পাঠকেব নিজস্ব কল্পনা ও মনন সক্রিয় অংশ গ্রহণ কবে ; আর তা করে বলেই শিল্পকলাব একটা আনুভূতিক সত্যরূপ আছে, যা শিল্প বিচারে উপেক্ষনীয় নয়।

শেক্সপীয়র-পৃথিবী থেকে ও'নীল-পৃথিবীব দূরত্ব কম নয়। শেক্সপীয়ব যুগ বর্তমান সভ্যতাব শৈশবকাল, ও'নীল যুগ তার মবণদশা। কালপ্রবাহেব এই দীর্ঘস্রোতে আমবা গোল্ডস্মিথের "where wealth accumulates man decays"-এব পবিচয় নিশ্চয়ই পেয়েছি। বর্তমান সভ্যতায় আমবা শুধু লাভবানই হয়েছি, কিছুই হাবাইনি, একথা কোন মতেই সত্য হতে পাবেনা। যেখানে আমবা হারিয়েছি এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি সবচেয়ে বেশী, সেটা হলো মানবধর্মেব ক্ষেত্রে। বাস্তব ঘটনা-চক্রেব প্রবল গতিবেগ আমাদের অনুভূতিহীন জড পদার্থে পবিণত কবেছে। আমরা যা বলি তাতে আমাদেব বিশ্বাস নেই ; যে আদর্শ অনুসরণেব প্রতিশ্রুতি জানাই, তা পালন কবিনা ; যে কাজ করি, তাকে ঘৃণা কবি। বাজারদবে যে আনন্দ ও পরিতৃপ্তি লাভেব সন্ধান করি, তাতে শ্রদ্ধা নেই ; যে স্বপ্নাভিসারে মত্ত হই, তাকে বাস্তবে রূপায়িত করাব সামর্থ্য নেই ; আর প্রতিদিন যে কত বিচিত্র বঞ্চনা এবং হীনতাব পরিচয় দিয়ে থাকি, তার কোন হিসাবই নেই। আমাদের মনের গহন আবর্তের বিষাক্ত পরিমণ্ডল নিয়ত আমাদের জীবনকে ক্ষয় করে চলেছে। এই হলো বর্তমান সভ্যতাব শেষ দশাব মানবিক পরিচয়। এর প্রতি ঘৃণা আমাদের অপরিসীম।

এই ঘৃণা ইউজেন ও'নীলেরও। সুতরাং শিল্পী হিসাবে ও'নীল

নিজেকে এক অদ্ভুত বস্তু-সম্পর্কে আবদ্ধ দেখতে পান। যে বস্তু-সত্যকে তিনি নাট্যরূপের কাঠামোয় প্রতিষ্ঠিত করে সমবেত জনমণ্ডলীর শ্রবণ-মনকে স্পর্শ করতে চান, তার প্রতি তাঁর আকর্ষণ নেই, আছে বিকর্ষণ। ওপরে যে সংঘাতের কথা উল্লেখ করেছি, তা ছাড়া শিল্পীমনের সঙ্গে বস্তু-সত্যের আরেকটা সম্পর্ক আছে যেটা এর ঠিক বিপরীত অর্থাৎ অন্বয়ধর্মী। এই দুই উপাদানের মধ্যে বিরোধ যেমন আছে, তেমন আত্মীয়তাও আছে। সংঘাতের পথ ধরে শিল্পীর মানস প্রকরণ ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে হতে এমন একটা মুহূর্ত আসে যখন বস্তু আর মন নিঃসংশয়ে একাত্ম হয়ে যায়। সেই মুহূর্তেই শিল্পীর মানসক্রিয়ার চরম রূপ। স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকলে এই অন্বয়ের কাজ যত সুসমঞ্জস ও সহজ হতে পারে, বিকর্ষণ তাকে ততটা দুরূহ ও সঙ্কটময় করে তুলে। ও'নীলের সৃষ্টি-কর্ম তাই সহজ নয়, হতে পারে না। ও'নীল নিজেও এ বিষয়ে সচেতন। নীচে তাঁর Dynamo নাটক সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব উক্তি উদ্ধৃত করছি। এই নাটকে নায়ক ইডিপাস্ কম্প্লেক্স-এ পীড়িত হয়ে দেশত্যাগ করে; পরে মায়ের মৃত্যুসংবাদ জেনে এক কারখানায় চাকুরি নেয়; ধীরে ধীরে তার mother-complex ডায়নামোকে ঘিরে আবর্তিত হতে থাকে; কিন্তু প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতা দিয়ে যে নারীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ সম্পর্ক তার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে সে তাকে খুন করে; এবং পরিণামে ডায়নামোর কাছে আত্মসমর্পণ করে আত্মহত্যা করে। এই নাটকটি সম্পর্কে ও'নীল বলেছেন (এই উক্তিটি ব্যারেট, এইচ্ ক্লার্কের ও'নীল-জীবনী গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে): এ হলো একটা "symbolic and factual biography of what is happening in a large section of the American (and not only

American) soul right now.......(It) will dig at the roots of the sickness of to-day as I feel it—the death of the old God and the failure of science and materialism to give any satisfactory new one for the surviving primitive religious instinct to find a meaning for life in, and to comfort its fears of death with" পুরাতন সামাজিক মূল্যমানের অস্তিত্ব আর নেই, অথচ তার স্থলে নবীন বা নবতর মূল্যমানের প্রতিষ্ঠাও হয়নি। সুতরাং মানুষ যদি মনে প্রাণে কোন আদর্শের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে না পারে, তাহলে আকাঙ্ক্ষিত জীবনাচরণ তার কাছ থেকে আশা করা বৃথা; তার আচরণ-বিকৃতি অবশ্যম্ভাবী। এই স্বীকৃতির ফলে জীবন বা পৃথিবী সম্পর্কে শিল্পীর মনোভাব আর নেতিবাচক থাকে না, অস্তিবাচক হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, সহজ বিশ্বাস-ভিত্তি অবলুপ্ত হওয়ায় যে নৈরাজ্যের আবির্ভাব, আর স্তূপীকৃত মিথ্যা ও অসামাজিক আচরণের যে পর্বত রচিত হয়ে চলেছে, তার বিস্ফোরণ-সম্ভাবনাকে ভয় করে তার হাত থেকে সার্বিক মুক্তিলাভের প্রেরণা (তা অস্ফুট হলেও) কখনও নেতিবাচক ধর্ম বলে গণ্য হতে পারে না। কারণ পূর্বেই উল্লেখ করেছি, শিল্পের জগৎ মায়ার জগৎ; তার আবেদনের সার্থকতার বিচার হলো আনুভূতিক সত্যের পরিপূর্ণতা দিয়ে। বাইরের প্রকাশ-রূপ তার যাই থাক, শিল্পী যদি তার আনুভূতিক রূপে রসে তাকে সত্যরূপে তুলে ধরতে পারেন, তবে তা ই তাঁর চরম ও পরম সার্থকতা বলে স্বীকৃত হবে। মনে হয়, ও'নীলের এ সার্থকতা সম্পর্কে কোন প্রশ্নই কোন মহল থেকে উঠবে না! ভাবী-কালের গহ্বরে নিহিত কোন রামরাজ্যকে প্রত্যক্ষ স্বাদ-গন্ধ স্পর্শের

পরিণিতে পৌঁছে দিতে না পারলেও যে কদর্য 'সভ্যতার' পৃথিবীতে আমাদের বাস, তার কুৎসিত রূপটা ও'নীল তাঁর অনন্য-সাধারণ অন্তর্দৃষ্টির যাদুতে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, এবং তার আবেশ থেকে আত্মমুক্তির পথ সন্ধান করার নির্দেশ দিয়েছেন। এর থেকেও বেশী কিছু দান করার দায়িত্ব শিল্পীর থাকতে পারে, কিন্তু এতটা পাওয়াও কম পাওয়া নয়।

ও'নীলের কাছ থেকে এতটাই বা আমরা পেয়েছি কিনা সে সম্পর্কে কারো কারো প্রশ্ন থেকে যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে ও'নীলের নিজের কথারই আশ্রয় নিতে হয়। তিনি বলেছেন, তাঁর আজীবন প্রচেষ্টাই হচ্ছে "to see the transfiguring nobility of tragedy..........in seemingly the most ignoble, debased lives............I'm trying to interpret life in terms of lives, never just lives in terms of character. I'm always acutely conscious of the Force behind—(Fate, God, our biological past creating the present, whatever one calls it—Mystery certainly)—and of the eternal tragedy of the Man in his glorious, self-destructive struggle to make the Force express him instead of being, as an animal is, an infinitesimal incident in its expression." অস্পষ্ট হলেও এ হলো শিল্পীর কথা। এই উক্তির সারমর্ম উপলব্ধি না করে সহজ চলতি সমালোচনার পরিভাষা ব্যবহার করে বলা যেতে পারে, ও'নীল এক দুর্জ্ঞেয় শক্তির প্রকাশলীলার পটভূমিতে মানুষকে ক্রীড়নকে পরিণত করেছেন। কিন্তু সহজ চলতি সমালোচনার বিপদ এখানে যে, তত্ত্বের

গভীরে অর্থাৎ গভীরতার গভীরে তা দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারে না। অজানা এক শক্তির স্বপ্রকাশ দুর্বার গতিতে নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছে ঠিকই; কিন্তু ও'নীলের এই চেতনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী হয়ে মিশে আছে আর এক গভীর চেতনা। তা এই, এই অবশ্যম্ভাবী পরিণতির পথে মানুষের ক্রিয়াও একটি অবিচ্ছেদ্য সেতুপথ। মানুষের চেয়ে অপেক্ষাকৃত শক্তিমান প্রতিপক্ষের সঙ্গে তার বিরোধ বলেই তার ট্র্যাজেডি। সংঘাতের অভাব হলে কোন ট্র্যাজেডিই সম্ভব হোত না। আর ট্র্যাজিডির মূল কথাই হলো এ'তে প্রতিবোধের ক্ষমতা থাকা চাই। যে জীবন আঘাতে ধূলোয় মিশে যায়, মাথা তুলে দাঁড়ায় না, সে জীবনে কোন ট্র্যাজেডিই নেই। ও'নীলের মধ্যে প্রতিরোধ আছে। ও'নীল কথিত উক্ত শক্তিপ্রবাহের ধারায় মানবক্রিয়া একটা অবিচ্ছিন্ন অংশ বলেই মানুষের পক্ষে নিষ্ক্রিয় থাকার উপায় নেই। তার সক্রিয় আচরণের পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার অবকাশ নেই। আর সেজন্যই সেই শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ না করে মানুষ সেই শক্তিকে পরাভূত করে। মানবপ্রকাশের বাহন করার জন্য মানুষের গৌরবোজ্জ্বল সংগ্রামের কথা ও'নীল উল্লেখ করেছেন। এই হলো আত্মচেতনার পরম কথা। এই চেতনাবলেই মানুষ আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য অশুভ অকল্যাণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত আছে। নাট্যশালার মাধ্যমে যে এ মনোভাবের স্ফুরণ করা চলে এবং তাকে বিকশিত করা চলে, এ চেতনাও ও'নীলের আছে। বার্নার্ড শ' তাঁর যবনিকাহীন যবনিকার স্বপক্ষে যুক্তি দর্শাতে গিয়ে বলেছিলেন, এর গূঢ় কথাটি হলো: জীবনের বাস্তব রূপের বহু চিত্র আপনার সম্মুখে এমন ভঙ্গীতে তুলে ধরা হয়েছে যে আপনার মনে

হবে ষ্টেজে প্রদর্শিত ঘটনাবলীর সঙ্গে আপনিও জড়িত, সুতরাং অপরাধী; অপরাধ স্খালন করে নিজেকে এবং সমাজকে বাঁচানার জন্য আপনাকেই তখন পথ খুঁজে বেড়াতে হবে। ও'নীলও ঠিক অনুরূপভাবে নিজের নাট্যদায়িত্ব সম্পর্কে বলেছেন যে, আধুনিক সামাজিক মূল্যবোধ ও প্রতীকের সাহায্যে তিনি ট্র্যাজেডি রচনার চেষ্টা করেছেন; যাতে আংশিকভাবেও আধুনিক কালের শ্রোতা ও দর্শক নাটকের নায়ক-নায়িকার মধ্যে আপন প্রতিচ্ছবি দেখতে পায়। বলা বাহুল্য, অভিনয়ে বর্ণিত জীবন বিসদৃশ, ভয়াবহ; এ জীবনের প্রতি আধুনিক দর্শকের ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা অপরিসীম। যাতে ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা, তাতে মানুষের আসক্তি নেই, গৌরব নেই; সে পরিচয়ে গভীর লজ্জা। সুতরাং এ সম্পর্কে আত্মচেতনার অর্থ তার প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হওয়া। আপাতদৃষ্টিতে ও'নীল-পৃথিবীর আকাশ কুয়াশাচ্ছন্ন হলেও ও'নীল সার্থকভাবে আমাদের মানবিক অনুভূতিতে ঘা দিয়েছেন। All God's Chillun Got Wings নাটকের শেষ দৃশ্যে যখন নায়ক জিম্ নায়িকা এলাকে বলছে, তোমার প্রতি যে অন্যায় করেছি তার জন্যে হয়তো ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করতে পারেন, তুমি আমার প্রতি যে অন্যায় করেছ, তার জন্যেও হয়তো তিনি তোমাকে ক্ষমা করতে পারেন, কিন্তু আমি জানি না তিনি নিজেকে কিভাবে ক্ষমা করবেন; তখন আমরা নিজেদের পরাভবের গ্লানিতে নিমজ্জিত বলে মনে করি না, যে শক্তির কাছে জিমের পরাভব তার প্রতি আমাদের নির্মমতাই বেড়ে যায়। ও'নীলের শ্রেষ্ঠতার পরিচয় এখানেই।

তাঁর সাম্প্রতিক নাটক The Iceman Cometh-এ মিথ্যা

আত্মপ্রিয়তা, নিজের মনকে চোখ ঠেরে কর্মহীন জীবনবেদের ভ্রান্ত ভয়াবহ যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত জীবনের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। সে পরিচয় এতই নির্মম যে প্রথম সাক্ষাতের পরেই এ জীবন-প্রসূত স্বল্পস্থায়ী সুখের প্রতি আর কোন মোহ থাকে না। নাট্যকার এই মোহ-মুক্তি ঘটিয়েছেন যেন shock therapy প্রয়োগ করে। কতখানি শোচনীয় জীবনের রূপ হ'তে পারে তার প্রচণ্ড আঘাত দিয়ে যেন ও'নীল মহৎ জীবনের প্রতি চোখ ফেরাতে বলছেন।

শেক্সপীয়র বা এস্কাইলাসের সঙ্গে ও'নীলের তুলনামূলক বিচারের চেষ্টা নিঃসন্দেহে হাস্যকর। তবে ও'নীল সম্পর্কে এটা নিশ্চিত-ভাবেই বলা যায় যে, পাঠকের মনকে আবিষ্ট করে রাখার ক্ষমতা তাঁর অসীম; আর এ গুণ নিঃসন্দেহে শেক্সপীয়রীয়। এ সার্থকতা তিনি অর্জন করেছেন মানব চরিত্রে অসাধারণ তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির বলে। নায়ক-নায়িকাকে বিচিত্র উপাদানে গড়া, স্থানকালের ভেদবিচারে তাদের বিস্ময়কর অথচ স্বাভাবিক আচরণে রূপান্তর ঘটানো, অতি সাধারণ ঘটনা ও উক্তিকে অসাধারণ ও ব্যাপক তাৎপর্যে মণ্ডিত করার দক্ষতা, ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাঁর সমকক্ষতা দাবী করা তাঁর সমসাময়িক নাট্যকারদের কারো পক্ষে সম্ভব নয় বলেই আমাদের বিশ্বাস। এ ব্যাপারে তাঁর ইতিহাস চেতনা প্রখর। বিশেষের মধ্যে নির্বিশেষের সন্ধান তাই অনায়াসেই তিনি দিতে পারেন; তাঁর কোন চরিত্রকেই ভৌগলিক সীমায় আবদ্ধ করা যায় না, বর্তমান কালের মানুষের জটিল মানসের রূপ ও অভিব্যক্তি ও'নীল একটি মাত্র চরিত্রাঙ্কণের ভিতর দিয়েই প্রকাশ করতে পারেন। সেজন্য তাঁর সৃষ্টি সর্বমানবিক।

ইউজেন ও'নীলের শ্রেষ্ঠতা বিচারে প্রসঙ্গত শ'র নাম এসে পড়ে। শ'তে বুদ্ধির ঝাঁজ আছে, বহুক্ষেত্রেই তা' আনুভূতিক আবেদন-বর্জিত; ও'নীলে বুদ্ধির ঝাঁজ নেই, আছে গভীর আত্মচেতনা ও বেদনাবোধ। তাঁর আবেদন তাই বুদ্ধির দরজা পার হয়ে অনুভূতির দরজায় আঘাত করে। চরিত্রাঙ্কণে ও'নীলের শ্রেষ্ঠতাও সর্ববাদিসম্মত।

কিন্তু এ হ'লো নিতান্তই বাইরের দিক। অন্তরের দিক থেকে বিকৃত পঙ্গু অবসাদগ্রস্ত চরিত্রের মধ্যেই মানবিক মূল্যের যে সশ্রদ্ধ প্রতিষ্ঠা ও'নীল অর্জন করেছেন, তার মধ্যেই তাঁর গৌরব। এই গৌরবকে স্বীকার করে নিয়েই বলতে হয় যে—'He writes not for a single theatre but for all theatres of the world'.

আষাঢ় ১৩৫৫

হাক্সলি ও ধনতন্ত্রের মৃত্যু

সুধীজনের মতে, কয়েক বছর আগেও যুরোপে ইংল্যাণ্ডের পরিচয়-পাত্র ছিলেন আলডুস্ হাক্সলি। জগৎজোড়া হাক্সলি সাহিত্যের যা প্রচার হয়েছে, তাতে উক্ত মন্তব্যের স্বাক্ষর মিলবে, কিন্তু ইংল্যাণ্ডের কোন্ পরিচয় হাক্সলি তাঁর পাঠককে জানিয়েছেন, তা আলোচনা করা এবং তার সামাজিক মূল্য নির্ধারণ করার প্রয়োজন আছে।

দুই মহাযুদ্ধের ঠিক মাঝামাঝি সময়ে সাহিত্যে আলডুসের আবির্ভাব। তখন ইংল্যাণ্ডের সামাজিক ভোজ-বাসরে দই পরিবেষণ করা হয়ে গিয়েছে। ভোজের প্রথম দিককার পরিচয় দিয়েছেন গলস্‌ওয়ার্দি। সোমস ফরসাইটের সংসার মানুষের হৃদয়-বৃত্তির সম্পর্ক দিয়ে গড়া নয়; সেখানে শুধু হৃদয় বৃত্তি কেন, মানুষেরও অস্তিত্ব নেই। মানুষে মানুষে সম্পর্কের বদলে সেখানে বস্তুতে বস্তুতে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কি মূল্য আছে তার স্ত্রীর, স্ত্রীর হৃদয়-বৃত্তির, হৃদয়াবেগের? সে তো নয় সুন্দরের প্রতিমূর্তি যা মনকে স্পর্শ করে, রক্তের প্রতিটি কণায় ঢেউ খেলে যায়, যাকে ভালবাসা যায়। কারণ, সোমস ফরসাইটের কাছে সুন্দর পদার্থটি অপরিজ্ঞাত, অপরিজ্ঞাত ভালবাসাও। তার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই বীজগণিতের ইকোয়েশনের মত। তার স্ত্রী শুধুই তার সন্তান-সন্ততির জননী, যার নিরঙ্কুশ স্বত্ব-স্বামিত্ব

তার একলাব। পারিবারিক, সামাজিক, ব্যবহারিক জীবনের প্রতিটি লেনদেন, প্রতিটি ঘটনাকেই সোম্‌স্‌ ফরসাইট তাব স্বত্ব-স্বামিত্বেব হিসেব-নিকেশ দিয়ে পরিমাপ কবে। তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে যৌবনের জোয়ার এসেছে, তার পণ্যের জাহাজে লেগেছে দৌরাত্ম্যের হাওয়া।

কিন্তু সারা পৃথিবীর ভাগ্যনিয়ন্তা হয়েও তাব মন চঞ্চল, অস্থিব। কোথা থেকে এলো সে? কোথায় তাব সামাজিক মূল? কি তার ঐতিহ্য? ঐ যে জীর্ণবসন শ্রান্ত শ্রমজীবী বৃদ্ধ ফবসাইট বলে নিজের পবিচয় দিলো, সে-ও কি তাব সগোত্র? তাদের ধমনীতে কি এক-ই বক্তের প্রবাহ? সমাজের এতো নীচুতে ছিল তার অধিষ্ঠান, যেখানে সৃষ্টি নেই, বিশ্ববিজয়ের গৌরব নেই, সামাজিক প্রতিপত্তি নেই, বিস্ময়কর ইতিহাস নেই? সোম্‌স্‌ ফবসাইট আব ভাবতে পারে না।

হঠাৎ আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হওয়ার স্থায়িত্বও কি তবে পদ্ম-পত্রে জলবিন্দুর মত? ইতিমধ্যেই পচন-কার্য আরম্ভ হয়ে গেছে। তার পরবর্তী বংশধরেবা তার বাপ-দাদার, তার নিজের নীতিবোধকে নির্মমভাবে আঘাত করে ধূলিসাৎ করে দিচ্ছে। সামাজিক পবগাছাদেব ক্ষুৎ-নিবৃত্তি আর আঙ্গুল ফুলে কলাগাছদেব মেদস্ফীতিতে যারা এতকাল স্বেচ্ছায় ইন্ধন জুগিয়ে এসেছে, তারাও বিদ্রোহ ঘোষণা করছে, আর একাজ তারা করবে না। নিজেরা অধিকার চায়, আর শুধু চায় না, আদায় করে নেওয়ার ভয় দেখায়। তবে কি যাবে, সব যাবে? ব্যাক্তিগত স্বত্ব-স্বামিত্ব থাকবে না? যে সম্পত্তি-সম্পর্কের সে রাজগুরু তা বাজেয়াপ্ত হবে, থাকবে না?

ইংল্যাণ্ডের সাম্রাজ্যবাদী শাসকশ্রেণীর এই শয্যাশায়ী অবস্থায়

আবির্ভূত হয়ে হাক্সলির পক্ষে বাস্তব পরিবেশকে বুদ্ধিগত করায় অসুবিধে হয়নি। পাঁচ বংশ ধরে হাক্সলি পরিবার ইংল্যাণ্ডের চিন্তারাজ্যে আধিপত্য করে আসছেন, পাঁচ বংশ ধরে ইংল্যাণ্ডের সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানে হাক্সলি পরিবার নতুন পথ অতিক্রমণের সন্ধান দিয়ে আসছেন; উত্তরাধিকার সূত্রে আল্‌ডুস যে মনন আর বিচারশক্তি দিয়ে বর্তমানকে আয়ত্ত করতে পারবেন, তা-ই স্বাভাবিক। আলডুস পেরেছেনও।

তাহলে এ পৃথিবী যাতে বিচরণ করছি যাতে বসে রাশি রাশি নিবন্ধ আর উপন্যাস রচনা করে যাচ্ছি, এর সামাজিক ইমারত শাশ্বত নয়। যেতে বসেছে, তার বিদায়ের ঘণ্টাধ্বনি শোনা যাচ্ছে। তাহলে কি গর্ব আছে এ ব্যবস্থার? কোন্ মহিমায় মানুষকে মহিমান্বিত করেছে এই ধনতান্ত্রিক সভ্যতা, বিজ্ঞানের প্রভু ধনিক শ্রেণী? কোন চিরস্থায়ী মূল্য সৃষ্টি করেছে? শুধুই কি গড়েনি দীনতা আর তুচ্ছতার পাহাড়? হাক্সলির শাণিত বিদ্রূপের আঘাতে এ সভ্যতা গুঁড়িয়ে পড়ে। অগাধ তাঁর পাণ্ডিত্য আর অদ্ভুত তীক্ষ্ণ তাঁর বুদ্ধি। তার স্পর্শে ধনতান্ত্রিক সভ্যতার পচে যাওয়ার, গলে যাওয়ার, কাহিনী ঝলসে ওঠে, বিদ্রূপের চকমকিতে আগুন জ্বলে। কয়েক বছর আগে স্ট্র্যাচি আলডুসের প্রতিভার এ দিককার সুন্দর বর্ণনা দিয়েছিলেন, "একদিন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ইংরেজেরা বৃটিশ ধনতন্ত্র নির্মাণ করেছিল, আর শেষে একজন মধ্যবিত্ত ইংরেজই সেই ধনতন্ত্রের পতনের কাহিনী রচনা করলেন।...উপন্যাসের পর উপন্যাসে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধে হাক্সলি তাঁর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের নিষ্ঠুর সরু সরু আঙুল ধনতান্ত্রিক সমাজের সমস্ত স্তরে বিস্তৃত করে দিয়েছেন। কোন একটি অন্ধকার কোণও তাঁর দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারে নি। আর তাঁর সিদ্ধান্ত অবিচলিত। সেটা

হলো' 'যেখানে ইচ্ছে যান, যা ইচ্ছে করুন, এই পচনশীল সভ্যতাব দুর্গন্ধ আপনি এড়াতে পারবেন না কিছুতেই।"

বর্তমান সমাজের দেহ ব্যবচ্ছেদ করে আলডুস যা পেয়েছেন, তাঁর মানসে এর যে সত্যিকারেব রূপ ধবা পড়েছে, তার সাব কথা এই। তাঁর পাত্র-পাত্রী দেহ-সৌষ্ঠবের দিক থেকে ত্রুটিযুক্ত, বুদ্ধিতে প্রদীপ্ত; প্রচুর স্বাস্থ্য, প্রচুব সংস্কৃতি আর জীবন তাঁদের কাম্য; কিন্তু জীবন তাদেব নিঃসঙ্গ, এই পৃথিবীতে তারা ক্ষমতাহীন, আব এ পৃথিবীকে যেমন তারা চায় না, জানে না এর পরেও নতুন ভবিষ্যৎ কিছু আছে কিনা। একদিক থেকে এব সকলেই হাক্সলির আত্মবিদ্রূপে বিকৃত, সময সময় উপহসিত বা আদর্শে রূপান্তরিত। কিন্তু প্রত্যেকেরই সঞ্চয হয়েছে বহুবিধ দুঃখময় অভিজ্ঞতা।

না কোন আশাই নেই এই পৃথিবীব।

তাহলে উপায হবে কি? শ' বলেছিলেন, মানুষ খুব মেসিন বানিয়ে প্রগতি হচ্ছে বলে নিজেদের ভোলাচ্ছে আব ভাবের ঘরে চুবি করছে, ...আসলে যদি মানুষ তার নিজের চরিত্র বদলাতে না পারে, তবে সমস্ত প্রগতিব আশা আমাদের ছেড়ে দিতে হবে।

ওয়েলস শ্রমজীবীদেব রাষ্ট্রে অবিশ্বাসী হলেও বিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁব খুব আশাবাদ ছিল। তিনি বলেছিলেন বিজ্ঞানের জোরে মানুষ একদিন ভগবান হয়ে যাবে।

লরেন্স বলেছিলেন, স্বপ্রতিষ্ঠ হও, তোমার বাইরে আর কিছু নেই। আত্মোপলব্ধি এবং আত্মপ্রতিষ্ঠা ছাড়া আর কোন কিছু নেই পৃথিবীতে।

পূর্বগামীদের এ মতবাদ হাক্সলি জানতেন, আর গোটা সমস্যাকেই

তিনি চিন্তারাজ্যের সুউচ্চ স্তরে রেখে যাচাই করেছেন ; সুতরাং তাঁর যাচাই-এর ফলটাও কলমের আঁচড়ে প্রতিভাত হবে সেটা খুব বেশী কথা নয়। উপন্যাসের ক্ষেত্রে আলডুসের যা অভিনবত্ব তা-ও এখানেই— কাহিনী আর নিবন্ধের সংমিশ্রণ। কাহিনী অংশে তাঁর পাত্র-পাত্রীর অভিজ্ঞতা আর নিবন্ধাংশে (অভিজ্ঞতার সঙ্গেই এটা অঙ্গাঙ্গী জড়িত) তাদের মনন-ক্রিয়া, জীবন ও পৃথিবী সম্পর্কে হাক্সলির নিজের কথা। ধন-তান্ত্রিক সভ্যতার পতন সম্পর্কে তিনি যেমন কৃতনিশ্চয় হয়েছেন, এবং সেজন্য এতে তাঁর বিশ্বাসও নেই, তেমনি যে প্রধান অস্ত্রকে অবলম্বন করে আমরা সভ্যতার এ স্তরে পৌঁছেছি, তাতেও তাঁর বিশ্বাস নেই। অর্থাৎ বিজ্ঞানে তাঁর বিশ্বাস নেই। যতো দীনতা, হীনতা, তুচ্ছতা এই পৃথিবীতে জড়ো হয়ে আছে, তাঁর মতে, এর মূলে আছে বিজ্ঞান। আর এই পৃথিবীর পরে আসবে যে পৃথিবী, বর্তমান সভ্যতার জীর্ণ ধ্বংস-স্তূপের উপর নতুন সভ্যতার যে কলি গজাবে, তাতে বিজ্ঞানের প্রয়োগও এই দীনতা, তুচ্ছতার আনুপূর্বিক ইতিহাস ছাড়া আর কিছু হবে না অর্থাৎ বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার বাইরের চেহারা যা-ই হোক না কেন তার আসল বক্তব্য এক ; তা বিশুদ্ধ,দীনতা মুক্ত কল্যাণময়, প্রাণবন্ত মানুষ বানাতে পারে না। সুতরাং বিজ্ঞানমুক্ত হও, ফিরে চল, দাও অরণ্য। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, যে আলডুস প্রথম জীবনে ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রকৃতি পূজাকে নির্মম ভাষায় বিদ্রূপ করেছিলেন অধ্যাত্মবাদ ঈশ্বরে বিশ্বাস ইত্যাদি যার কাছে ছিল পাকস্থলীর সংবেদন মাত্র ইউরোপীয় সভ্যতার সমস্ত স্তর, যার আঙ্গুলের ডগায় তিনি বিজ্ঞানকে যুক্তিহীন, মাত্রাহীন, পরিপ্রেক্ষিতে ফেললেন কি করে ?

হাক্সলির হাতে বিজ্ঞানের এই গতি বা দুর্গতি সৃষ্টির রসায়নাগারের

জটিল মিশ্রণ-সংমিশ্রণের নিয়মেব অপেক্ষা রাখে না। কারণ, শ'ব সুবিখ্যাত উক্তি উদ্ধৃত করে আলডুসও বলতে পারেন, আমার সুস্পষ্ট জীবনাদর্শ আছে; আদর্শ বাদ দিলে আমি স্বয়ং আমার বেঁচে থাকার মূল্য অস্বীকার করব।

তাঁর বক্তব্য বিশুদ্ধ স্বর নয়, যা আপনাতে আপনি অভিব্যক্ত; তাঁব বাহন কথা; আর কথা যত প্রতীক বা প্রতিরূপকেই আশ্রয় করুক না কেন, তাব অর্থ আছে, যা এক মন থেকে আবেক মনে সঞ্চারিত হয। এক হৃদয়ের কাছে আবেক হৃদয়েব বাণী বহন কবে নিয়ে যায়। হাক্সলিবও বক্তব্য আছে, আব তাঁব চেতন-অচেতন-অর্ধচেতন মনের অপরূপ লীলায় তাঁব সৃজনক্রিয়া যেভাবেই আবর্তিত হোক না কেন, তাঁর বক্তব্য সম্পর্কে তিনি সচেতন কিন্তু সমস্যা তাঁব পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে। প্রসঙ্গতঃ ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে তাঁর অনুরাগের প্রশ্ন আসে। ভাবতীয় দর্শনে তাঁব পাণ্ডিত্য আছে; শোনা যায় যোগ-অভ্যাস কবে হাক্সলি তাঁর চক্ষু-চিকিৎসা করেছিলেন, ফললাভও নাকি করে-ছিলেন। এই ব্যবহাবিক দিকটা তাঁব মানসিক সংগঠনে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছে, তার মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব হবে না। কিন্তু আলডুস্ তাঁব পবিপ্রেক্ষিত নির্বাচনে ভারতীয় দর্শনের আনুগত্য স্বীকার কবে নিয়েছেন। তাতে পরিপ্রেক্ষিত কিছুটা কৌলিন্য অর্জন করেছে এইমাত্র।

হাক্সলি নিজেও স্বীকার করবেন, মানুষের জানার আর আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের প্রেরণা সীমাহীন। সেই প্রেরণাই মানুষকে এতো বিচিত্র অভিযানে ধাবিত করেছে, করে এবং করবে। বিজ্ঞান মানুষের সেই যাত্রারই বিজয়-নিশান। বিজ্ঞানই মানুষের জড এবং আধ্যাত্মিক

মুক্তি এনে দিয়েছে। কিন্তু আলডুস বর্তমান সমাজের যে পচনক্রিয়া লক্ষ্য করে ঘৃণায় সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছেন, তা বিজ্ঞানের অপরাধ নয়; বিজ্ঞানকে আধুনিক সমাজের ভাগ্যবিধাতারা যেভাবে ব্যবহারিক জীবনে সংগঠিত করেছেন, এবং যে সংগঠন মানুষের সাংস্কৃতিক মূল্য-বোধকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র করে দিয়েছে, অপরাধ সে ব্যবস্থার। এ অবস্থাটাও একদিনে হয়নি। এর জন্ম আছে, বিবর্তন আছে, আবার জন্মান্তরও আছে। ধনতন্ত্র যেসব ত্রুটির জন্ম দিয়েছে, যা আমাদের আকর্ষণ করে না বিকর্ষণ করে, আর যা মানুষের ক্ষুদ্রতার বিজয়-গাঁথায় সমৃদ্ধ থাকতে চায়, তা সম্পূর্ণ প্রতিরোধ্য। মানুষ তার কর্মে এ ব্যবস্থার রূপান্তর ঘটিয়ে সেগুলির মূলোৎপাটন করতে পারে। কিন্তু হাক্সলির এ পরিপ্রেক্ষিত নেই, সুতরাং এ বিশ্বাসও নেই।

আর মানুষ তার বিশ্বাস অথবা অধ্যাস (ইলিউসন) নিয়েই বাঁচে, সৃষ্টি করে। অধ্যাসবিমুক্ত বাঁচা জীবন নয়। যে মন সৃষ্টির প্রেরণায় ব্যাকুল, যে মনে নিরন্তর চলেছে আরো জানা—আরো উপলব্ধি করা—আরো আলোক লাভের প্রচণ্ড আলোড়ন, সে মনের বিশ্বাস-ভিত্তি শিথিল হয়ে বা ভেঙ্গে গেলে বা উপযুক্ত পরিপ্রেক্ষিত না পেলে তা কিছুতেই ভারসাম্য রাখতে পারে না। জীবনের স্বাদ আর কিছুই থাকে না। প্রথম জীবনের কয়েকটি ব্যাকুল প্রচেষ্টার পর হাক্সলি আজও বেঁচে আছেন বটে, কিন্তু তাতে আর জীবন নেই, সৃষ্টি নেই। প্রচেষ্টাকালেও তার তীক্ষ্ণবুদ্ধি তাঁর আঘাত করার ক্ষমতা আর তাঁর স্টাইল আমাদের মুগ্ধ করেছে, কিন্তু অভিভূত করেনি; যেমন করে আমরা অভিভূত হই, গল্‌সওয়াদি বা লরেন্স পড়ে। আলডুস ওদের চেয়ে বুদ্ধিতে আর পাণ্ডিত্যে

বড়, কল্পনায় খাটো। এ অভাবটা তাঁর অসম্পূর্ণতার জন্য কতকাংশে দায়ী হতে পারে, কিন্তু শাণিত-বুদ্ধি হয়েও নিজের অসম্পূর্ণতা ধরতে না পেরে এবং খাঁটি পরিপ্রেক্ষিত হারিয়ে আলডুস তাঁর প্রতিভাকে খণ্ডিতই করেছেন। আর, আপেক্ষিকভাবে, প্রমাণ করেছেন যে, পতনশীল ধনতান্ত্রিক সভ্যতা তার পতনকে ঠেকিয়ে রাখার আর কোন যুক্তিই অবশিষ্ট রাখেনি।

তাহলে ইংল্যাণ্ডের এ পরিচয়ই (ধনতান্ত্রিক সভ্যতার পতন) আলডুস অবশিষ্ট পৃথিবীকে জানিয়েছেন। পাঁচ বংশ ধরে হাক্সলিরা ইংল্যাণ্ডের সাংস্কৃতিক জীবনে আধিপত্য করে এসেছেন। ইংল্যাণ্ডের ধনতন্ত্রের আয়ুও প্রায় অনুরূপ। কিন্তু তার মৃত্যু অনিবার্য। ঘর থেকে মৃতদেহ বের করার মুহূর্তে দৃষ্টি হারিয়ে আলডুস কি এটাই প্রমাণ করলেন, ইংল্যাণ্ডে হাক্সলি পরিবারের চিন্তানায়কত্বের আয়ুও এখানেই শেষ।

ভাদ্র, ১৩৫৬